Vol. 31 | No. 2 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

‘সওগাতে' সাহিত্যচিন্তা : ‘সম্পাদকীয়' ও ‘সাময়িকী '

Volume	31
Issue	2
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	February 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i2.2
Pages	43-102
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

'সওগাতে' সাহিত্যচিন্তা : 'সম্পাদকীয়' ও 'সাময়িকী'

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

'সওগাতে'র সম্পাদকীয় নানা শিরোনামে প্রকাশিত হত ; যেমন—"নিবেদন", "সম্পাদকের দফতর", "সম্পাদকের কথা"। প্রধানতঃ সামাজিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গই ছিল সম্পাদকীয়সমূহের বিষয়। মাঝে মাঝে সাহিত্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো প্রকাশিত হয়েছে "সম্পাদকের দফতর" শিরোনামে।

১ জাতীয় সঙ্গীত (৫ : ৯)
২ জাতীয় সঙ্গীত (৫ : ১০)
৩ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনী (৫ : ১০)
৪ তরুণদের সাহিত্য-সাধনা (৭ : ৯-১০)

বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" গানটি "জাতীয় সঙ্গীতের" স্বীকৃতি পেতে পারে কিনা—এ সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে দু'টি সম্পাদকীয় নিবন্ধ (৫ : ৯, ফাল্গুন ও ৫ : ১০ চৈত্র ১৩৩৪)। সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিমত তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। প্রথম নিবন্ধে, 'আনন্দমঠে'র পটভূমি উল্লেখ করে, 'সওগাত' এই গানটি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের কাছে—বিশেষত মুসলমানদের কাছে—গ্রহণীয় নয় বলে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'সওগাত' আইনজীবী এন. এন. সরকারের যুক্তি সমর্থন করেছেন। গানটির বিরুদ্ধে মিস্টার সরকার দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেন : প্রথমত এই গান আনন্দমঠের 'মুসলিম বিদ্বেষের গন্ধ'যুক্ত দ্বিতীয়ত 'এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতাপূর্ণ'। আরো অনেকের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল এই অভিমতের প্রতিবাদ করেন। 'সওগাত' লিখছেন : "হিন্দু ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই পর্যন্ত বাদ-প্রতিবাদ হইয়াই ব্যাপারটার উপর ধামাচাপা পড়িয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ হইতে উহার উপর

ধামাচাপা পড়া উচিৎ নহে।" 'সওগাত' ইংরেজ-তোষক মুসলমানদের 'রুল ব্রিটানিয়া' সঙ্গীতপ্রীতি এবং 'কাবুলতুর্কী' মুখী মুসলমানদের বাংলা ভাষা বিমুখতার উল্লেখ করে বলেছেন, "যাহারা হিন্দুদের সহিত এদেশে একত্রে বাস করিবেন, তাহাদেরই কেবল একটি জাতীয় সঙ্গীতের আবশ্যকতা আছে।" এই মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সওগাত' অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "আমাদের মতে সঙ্গীতটির গোড়ার কথা ও অর্থ কোনও দিক দিয়াই উহা মুসলিম সমাজের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।" 'সওগাত' এই সঙ্গে যোগ করেছেন, "আর অর্থের দিক দিয়া উহা কেবল মুসলমানদেরই আপত্তিজনক নহে ভারতীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদেরও উহাতে আপত্তি আছে।"

'সওগাতে'র এই পরামর্শ প্রদানের পর পরই 'বশীরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী'তে বন্দেমাতরম জাতীয় সংগীত হিসেবে গীত হয় এবং উপস্থিত সকলে সঙ্গীত পরিবেশন কালে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় নিবন্ধে এই ঘটনায় 'সওগাতে'র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। 'সওগাত' বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, মিলাদে কিয়ামের প্রতিবাদকারী মুসলমান কিভাবে এই 'পৌত্তলিকতাপূর্ণ সঙ্গীতগান' করবার সময় উঠে দাঁড়াল! নিবন্ধের উপসংহারে 'সওগাত' লিখেছেন যে মুসলমানদের কাছে এই সঙ্গীত গ্রহণযোগ্য নয় সুতরাং "আমরা আবার অনুরোধ করিতেছি, জাতীয়তাবাদী হিন্দু চিন্তা নায়করা বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন।"

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বশীরহাটে, সভাপতি ছিলেন মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। এই অধিবেশনকে অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে 'সওগাতে'র ৫ : ১০ চৈত্র ১৩৩৪ সংখ্যায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী' শিরোনামে। 'সওগাতে'র আর একটি বিশিষ্ট সম্পাদকীয় নিবন্ধ "তরুণের সাহিত্য সাধনা" (৭ : ৯-১০, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)। নিবন্ধে সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান তরুণদের কর্তব্য আলোচিত হয়েছে। 'সওগাত' তরুণদের 'সাধনার' ও পরিশ্রমের পথে সৃষ্টিশীল ও মননশীল রচনায় উৎকর্ষ লাভের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এই নিবন্ধে।

দুই

'সম্পাদকের দফতর' শিরোনামের সম্পাদকীয় কলাম ছাড়াও 'পাচরঙা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'সাময়িকী' প্রভৃতি শিরোনামে 'সওগাত' বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও সংবাদের বিষয়: সাহিত্য সম্মেলন, কবি-সাহিত্যিক সংবর্ধনা, প্রয়াত সাহিত্যিক, নবীন সাহিত্যিক প্রভৃতি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও মন্তব্যের তালিকা নীচে দেয়া হল:

৫ নবীন সাহিত্যিক (২ : ৮-১১ ॥ পাঁচরঙা ৩)
৬ মরহুম কাজী ইমদাদুল হক (৪ : ১ ॥ বিবিধ প্রসঙ্গ)
৭ মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন (ঐ)
৮ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি (৪ : ৩)
৯ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ (৫ : ৩)
১০ কবিবর যোগীন্দ্র বসু (ঐ)
১১ কবি সম্বর্দ্ধনা (৭ : ৫ ॥ বিশেষ নিবন্ধ)
১২ শরৎ-সম্বর্দ্ধনা (৯ : ২ ॥ সাময়িকী)
১৩ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন (৯ : ৫ ॥ সাময়িকী)
১৪ শ্রী নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা (৯ : ৬ ॥ সাময়িকী)
১৫ পরলোকে মাক্‌সীম গর্কী (১৯ : ৩ ॥ সাময়িকী)
১৬ পরলোকে শরৎচন্দ্র (২০ : ৩)
১৭ পরলোকে প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন (২১ : ৬ ॥ সাময়িকী)
১৮ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন (২১ : ৭)
১৯ মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন (২১ : ৭ ॥ সাময়িকী)
২০ চীনা লেখকদের আন্দোলন (২৬ : ২)
২১ রোমাঁ রোলাঁর আদর্শ (২৬ : ২)
২২ সাহিত্যিকদের সাহায্য (২৬ : ৯)
২৩ সাহিত্যিক বৃত্তিদান (২৬ : ১০)
২৪ পরলোকে রোমাঁ রোলাঁ (২৭ : ৩)
২৫ কবি হালীর মৃত্যু বার্ষিকী (২৭ : ৩)
২৬ কবি কুমুদরঞ্জন (২৭ : ৪ ॥ সাময়িকী)

'নবীন সাহিত্যিক' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে (২ : ৮-১১, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩২৭ ॥ পাঁচরঙা ৩) 'সওগাত' পুনরায় বাঙালী মুসলমান নবীন

সাহিত্যিকদের "সাধনায় ব্রতী" হবার আহ্বান জানিয়েছেন। এই নিবন্ধে পদ্যরচনায় অধিক ঝোঁকের বিপত্তি প্রসঙ্গে পদ্য ও কবিতার পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে :

> কবিতা অর্থ পদ্য হয়তো হইতে পারে কিন্তু পদ্য অর্থ কবিতা নহে। কবিতা সৌন্দর্য্যের অপূর্ব সৃষ্টি—পদ্য অক্ষরে অক্ষরে মিল দেওয়া কথা। নবীনদের এই তফাৎ ভুলিলে চলিবে না।
>
> যাহার অন্তরে সৌন্দর্য্যের খনি নাই সে পদ্য লিখিলেও লিখিতে পারে, কবিতা লিখিবে কি প্রকারে ?

প্রসঙ্গতঃ 'সওগাত'-এ নবীন লেখকদের গদ্য রচনায় "কীর্তিমান হওয়ার" জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান করা হয়েছে।

৪ : ১, আষাঢ় ১৩৩৩ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ বিভাগে কাজি ইমদাদুল হকের পরলোকগমনে প্রকাশিত হয়েছে 'মরহুম কাজি ইমদাদুল হক' শিরোনামে একটি নিবন্ধ। এই নিবন্ধে প্রয়াত লেখকের কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের সঙ্গে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যকীর্তির মূল্য ও তাৎপর্য। 'সওগাত' লিখেছেন :

> বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ অথবা মুসলমান সমাজের নেতৃবর্গ যখন অস্বাভাবিক উর্দু-প্রীতির পরিচয় দিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষার আসন হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন যে সকল দূরদর্শী ব্যক্তি এবংবিধ প্রচেষ্টার ঘোর অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য সেবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন ও তাদ্বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন মরহুম কাজী সাহেব তাঁদের অন্যতম। আজ মুসলমান সমাজে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী লেখক ও কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু এমনও সময় গিয়াছে যখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সেবার পরিবর্তে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ ভিন্ন অন্য কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। এ হেন যুগে মরহুম কাজি ইমদাদুল হক মাতৃ-সাহিত্য সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়া যুগপৎ যেরূপ দূরদর্শন ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সাধারণ নহে।

ঐ একই সংখ্যায় (৪ : ১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির জুলাই ১৯২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে "মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন" শিরোনামে। ৪ : ৩, ভাদ্র ১৩৩৩ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে ব্যরিস্টার এম. ওয়াজেদ আলীর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে" গৃহীত তিনটি প্রস্তাব। প্রথম প্রস্তাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হওয়ায় সমিতি 'আনন্দ প্রকাশ' করে বলেন যে "এই ব্যবস্থা বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদিগের বিদ্যা চর্চা ও চিন্তা শক্তির উন্মেষের পক্ষে অতীব কল্যাণপ্রদ" হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে "বঙ্গ সাহিত্য যাহাতে সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট এবং সমগ্র বাঙ্গালী জীবন ও মনোভাবের স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি হয়" সেজন্য কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকায় "মুসলমান গ্রন্থকারগণের রচিত ইসলামী ভাবধারায় প্রকাশিত উৎকৃষ্ট পুস্তক-সমূহ যথেষ্ট সংখ্যায়" অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়। উভয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আরো অনুরোধ জানানো হয় যে "মুসলমান-দিগের বিশিষ্ট রুচিগত ও ধর্মগত ভাবের পরিচায়ক" "আরবী-ফারসী জাত" শব্দ যেন "মুসলমান পরীক্ষার্থীগণ... উত্তরপত্রে অবাধে ব্যবহার" করতে পারে এবং "তদনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণকে উক্ত মর্ম্মে" যেন "উপদেশ প্রদান করা" হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বীরভূম অধিবেশনে "মৌলবী গোলাম মোস্তফা সাহেবের প্রস্তাব মতে ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে গৃহীত অনুরূপ প্রস্তাবের সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।

৫ : ৩ ভাদ্র ১৩৩৪ সংখ্যায় নাট্যকার ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও কবি যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরলোক গমনে 'সওগাতের' শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে "পণ্ডিত ক্ষিরোদপ্রসাদ" এবং "কবিবর যোগীন্দ্রবসু" শিরোনামে। ক্ষিরোদপ্রসাদ রসায়নে এম. এ. ডিগ্রীলাভ করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, পরে অধ্যাপনা ত্যাগ করে 'সাহিত্য সাধনায়' আত্ম নিয়োগ করেন। ১৮ই আষাঢ় ১৩৩৪ সনে ৫৭ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর বাঁকুড়ার "পল্লী নিবাসে" মৃত্যুবরণ করেন। 'সওগাত' ক্ষিরোদপ্রসাদকে "বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার" বলে অভিহিত করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ বসুও শিক্ষক

ছিলেন। তিনি পরলোকগমন করেন ৭১ বৎসর বয়সে। কবি ও মধু-সূদনের জীবনীকার হিসেবে তিনি সুখ্যাত ছিলেন।

৭ : ৫ পৌষ ১৩৩৬ সংখ্যার একটি বিশেষ নিরন্ধ "কবি-সম্বর্দ্ধনা"। ২৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে কলকাতার এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত কাজী নজরুল ইসলামের সম্বর্ধনা সভার এই বিবরণে নজ-রুলের ইংরেজী স্বাক্ষরিত একটি ছবি ছাড়াও সভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি "মিঃ এস. ওয়াজেদ আলি বি.এ. (ক্যান্টাব), বার এট-ল"-এর ছবি মুদ্রিত হয়। বিবরণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা, এস. ওয়াজেদ আলি পঠিত "গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে নজরুল সম্বর্দ্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ" প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র, নলিনীকান্ত সরকার রচিত আবাহন সঙ্গীত, কবির উত্তর এবং সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন একাধিকবার এই সভার উদ্যোগ, আয়োজন ও বিবরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। (দ্রষ্টব্য: বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৭২৬-৭৬১) ঐ বিবরণ থেকে জানা যায় যে জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ঐ সম্বর্ধনা সমিতির সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। নজরুলের এই সম্বর্ধনা কালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছাপ্পান্ন বৎসর অতিক্রম উপলক্ষে কলকাতায় ৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ তারিখে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। "কিন্তু দেশের রাজনীতিক পরিস্থিতির জন্য ঐ তারিখে সম্বর্দ্ধনা বন্ধ" রাখতে হয়; সভা অনুষ্ঠিত হয় "২রা আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে।" কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রমথ চৌধুরী। সভার বিবরণ 'সওগাতে'র ৯ : ২ আশ্বিন ১৩৩৯ সংখ্যায় সাময়িকী বিভাগে প্রকাশিত হয়।

এই সম্বর্ধনা সভার একদিন আগে ১লা আশ্বিন ১৩৩৯ তারিখে কল-কাতার সিনেট হলে 'ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ' 'শরৎ সম্বর্ধনা'র আয়োজন করে। অভিনন্দনপত্র ও শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার অংশও 'সওগাতে'র ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

৯ : ৫ পৌষ ১৩৩৯ সংখ্যার সাময়িকীর বিশেষ নিবন্ধ—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের বিবরণ। কলকাতার এলবার্ট হলে ২৫ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি ছিলেন কবি কায়কোবাদ। বিবরণে কবি কায়কোবাদের অভিভাষণটি মুদ্রিত হয়েছে। অভিভাষণে কায়-কোবাদ বলেন :

> এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক প্রকারের বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য আর এক প্রকারের বাঙ্গালা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাহাদের কেহ নহি। আমি বাঙ্গলার হিন্দু এবং বাঙ্গলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই।...
>
> বাঙ্গলাদেশ আমাদের মাতৃভুমি। এই মাতৃভুমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে যাহারা খণ্ডিত করিতে চান, আমি তাহা-দের রুচির ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না।

৯ : ৬ মাঘ ১৩৩৯ সংখ্যার 'সাময়িকী'র একটি অংশে মুদ্রিত হয় : "শ্রী নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা"। রবীন্দ্রনাথ ঐ বক্তৃতায় বলেন :

> আমাদের দেশের জনকয়েক সাহিত্যিক লিখে জানিয়েছিলেন যে, আমি দেশের এই দুর্দ্দিনে ভাববিলাসে মগ্ন, কেবল কবিত্বই করি। অনেকেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিত্ব নিয়েই মেতে আছেন। একথা শুধু বাঙ্গলাদেশ আমায় বলেছে, সমুদ্র পারের লোকেরা নয়। আমার দেশবাসীরা মনে করেন—কর্ম্ম করেন তাঁরাই, যাঁরা ভোট যুদ্ধ ও ভোট গণনায় ব্যস্ত এই অভিযোগের প্রতিবাদ রয়েছে আমার এই কর্ম্মক্ষেত্রে (শান্তিনিকেতন)। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হল যে আমি শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে কিছুই পেলাম না, কিন্তু আমার সান্ত্বনা শুধু এই এবং এই বিশ্বাস নিয়েই আমার কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি যে, গ্রামবাসীরা আমাকে পরমাত্মীয় করে নিয়েছে।

ম্যাকসীম গর্কীর পরলোকগমনে 'সওগাতে'র ১৯ : ৩, আষাঢ় ১৩৪৩ সংখ্যায় 'সাময়িকী' বিভাগে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ নিবন্ধে লেখা হয় :

> রাশিয়ার জগদ্বিখ্যাত সর্বহারা-ঔপন্যাসিক ম্যাকসীম গর্কী আর ইহজগতে নাই।...
>
> রাশিয়ার সাহিত্যাকাশে গর্কীর উদয় নব প্রভাতের নবীন সূর্যের মতো।...
>
> মুক্তির বৃহত্তর লক্ষ্য লইয়া যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গর্কীর স্থান সর্ব্ব উচ্চে। টলস্টয়ের সাহিত্য ছিল ধর্ম্মপ্রবণ আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ। দস্তয়ভস্কির সাহিত্যে কেবল হতাশ দুঃখের গান। কিন্তু গর্কী আসিলেন সেখানে বিদ্রোহের রক্ত ঝাণ্ডা উড়াইয়া। নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে গভীর এক সৌন্দর্য্য-বোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার সাহিত্যে।

২রা মাঘ ১৩৪৪ তারিখে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। 'সওগাতে'র ২০ : ৩, মাঘ ১৩৪৪ সংখ্যায় 'পরলোকে শরৎচন্দ্র' শিরোনামে এক বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও লেখক শরৎচন্দ্রের পরিচয় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শরৎপ্রতিভার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে নিবন্ধের মন্তব্য নিম্নরূপ :

> ...রচনার সাবলীল ভঙ্গী, উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির কথোপকথনের সরল মনোরম স্বাভাবিকতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্ব শরৎচন্দ্রের রচনাকে...বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।... এই আন্তরিকতা, এই সত্যদৃষ্টি এবং ভাষার এই মনোরম স্বচ্ছতাই শরৎচন্দ্রের রচনাকে এতটা জনপ্রিয় করিয়াছে।

১৯৩৯ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে "ভারতবর্ষ" সম্পাদক, ঔপন্যাসিক জলধর সেন পরলোকগমন করেন। ২১ : ৬ বৈশাখ ১৩৪৬ সংখ্যা 'সওগাতে'র সাময়িকী বিভাগের প্রথম নিবন্ধে জলধর সেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে।

৬ই মে ১৯৩৯ সালে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন "বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় এ. কে. ফজলুল হক"। ভাষণে ফজলুল হক সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে সাহিত্য সেবার আহ্বান জানান। ২৭ : ১, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ফজলুল হকের ছবি ও ভাষণের অংশবিশেষ মুদ্রিত হয়। এই সংখ্যার 'সাময়িকী' বিভাগে অবশ্য এই সম্মেলন প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। "মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন" শীর্ষক ঐ প্রতিবেদনে লেখা হয় : "সাহিত্য ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় রাজনীতি ঢুকাইলে তার ফল এমনি হইতে বাধ্য। আশা করি ভবিষ্যতে সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা এদিকে অবহিত হইবেন।"

২৬ : ২ পৌষ ১৩৫০ সংখ্যায় "চীনা লেখকদের আন্দোলন" একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। এ প্রসঙ্গে মন্তব্যকালে 'সওগাত' বাঙালী লেখকদের দুরবস্থাও তুলে ধরেছেন। ঐ একই সংখ্যায় রোমাঁ রোলাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার ও সে সম্পর্কে সংশয়ের পটভূমিতে লেখা হয়েছে : "রোমাঁ রোলাঁর আদর্শ" শীর্ষক নিবন্ধ। ১৯৩৫ সালে জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাসের জন্য সাহিত্যে নেবেল পুরস্কার বিজয়ী রোমাঁ রোলাঁ মূলতঃ ছিলেন শান্তিবাদী। এ কারণে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজরোষে পতিত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী বন্দীশালায় অবরুদ্ধ হন। একথা উল্লেখ করে 'সওগাতে' লেখা হয় :

> রোমাঁ রোলাঁর মতবাদ মোটামুটি এই যে, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষে মানুষে বিরোধ, অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের মূলীভূত কারণ। তাই জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আধ্যাত্মিকতাবাদই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ উপায়। ইয়োরোপ তাঁর এই মতবাদ মানিতে প্রস্তুত নয়; তাই আদর্শবাদী রোমাঁ রোলাঁর স্বীকৃতি প্রাচ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এটা তার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, বলা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, যদি রোমাঁ রোলাঁর মনীষা বস্তুতান্ত্রিক পথে জাগতিক শান্তির সন্ধানে তাঁকে চালাইয়া দিতে পারিত, তিনি প্রাচ্যের মৃত্যুবাহী আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বাস্তবতর কোন উপায় অবশ্যই দেখিতে পাইতেন। তাহইলে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবখানেই তার আদর্শের অর্থ বোধগম্য হইত।

নিবন্ধের শেষাংশের এই বক্তব্য 'সওগাতে'র দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ব্যঞ্জক এবং উচ্চ প্রশংসার দাবীদার।

২৬ : ৯, শ্রাবণ ১৩৫১ সংখ্যায় "সাহিত্যিকদের সাহায্য" শিরোনামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দুর্গত কবি সাহিত্যিকদের মাসিক সাহায্য দান প্রসঙ্গে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বাংলা গবর্নমেন্টকে ত্রিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করার অনুরোধ প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইলে ঐ 'প্রশংসনীয়' প্রস্তাব সমর্থন করে 'সওগাত' এই নিবন্ধ লেখেন।

পরবর্তী সংখ্যায় (২৬ : ১০, ভাদ্র ১৩৫১) প্রকাশিত হয়েছে অসুস্থ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে "সাহিত্যিক বৃত্তিদানে'র সংবাদ। 'সওগাত' অন্যান্য 'দুর্গত' 'শক্তিমান সাহিত্যসেবী'কেও সাহায্য প্রদানের আবেদন জানান।

২৭ : ৩, মাঘ ১৩৫১ সংখ্যায় রোমাঁ রোলাঁর ফ্রান্সে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমনের সংবাদ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়েছে। ঐ সংখ্যায় বিখ্যাত উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালীর ৩০শ মৃত্যু-বার্ষিকী উদযাপনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ হালীর ছবিসহ ছাপা হয়। "বঙ্গীয় আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু"র উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মিসেস সরোজিনী নাইডু।

২৭ : ৪, ফাল্গুন ১৩৫১ সংখ্যায় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের ৬২ তম জন্মতিথি উপলক্ষে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের সংবাদ "কবি কুমুদরঞ্জন" শিরোনামে ছাপা হয়েছে। কবিসম্বর্ধনায় 'সওগাত' আনন্দ প্রকাশ করে লিখেছেন :

> তিনি যেরূপ নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা কাব্য সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাহাতে বহু পূর্বেই তাহার সম্বর্ধনা হওয়া উচিত ছিল।

এই মন্তব্যের পর ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দেমাতরম' গান এবং 'হিন্দু প্রথায় মঙ্গলাচরণ' ইত্যাদির দ্বারা 'ব্যাপারটী সম্পূর্ণ হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত' করার সমালোচনা করেছেন 'সওগাত'। 'সওগাতে'র প্রশ্ন : "কবিকে কি বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয় নাই?"

সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন মন্তব্যে ও নিবন্ধে মুসলিম প্রসঙ্গ বিশেষ বিবেচনাধীনে আনা সত্ত্বেও 'সওগাত' হিন্দু মুসলমান উভয় প্রসঙ্গ সামগ্রিক দৃষ্টিতে উপস্থাপনে প্রয়াসী থেকেছেন। এখানেই 'সওগাতে'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

পরিশিষ্ট

(সংকলন)

৫ : ৯ ।। "জাতীয়সঙ্গীত"

"কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' উৎসব উপলক্ষে কলেজ-ইউনিয়নের সম্পাদক মিঃ প্রমোদ ঘোষাল জাতীয় সঙ্গীতে'র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ ষ্টেপ্‌ল্‌টন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, এই মর্ম্মে একটা সংবাদ সংবাদ-পত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আমাদের দেশীয় সংবাদ-পত্রসমূহের প্রায় সকলেই আমাদের 'জাতীয় সঙ্গীতে'র অপমান করার অভিযোগে মিঃ স্টেপ্‌ল্‌টনের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন। পরে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বয়ং মিঃ স্টেপ্‌লটনের কৈফিয়তে প্রকাশ পাইয়াছে যে মিঃ স্টেপ্‌ল্‌টন 'জাতীয় সঙ্গীতে'র অপমানকর কোন কার্য্য করেন নাই। সুতরাং ও ব্যাপার ঐখানেই মিটিয়া গেল।

কিন্তু এই ব্যাপারে যে একটা প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, তাহার কোনও মিটমাট হইল না। হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী মিঃ এন্. এন্. সরকার এই উপলক্ষে সংবাদ-পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক যে সঙ্গীতটা আজকাল 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, উহাকে 'জাতীয় সঙ্গীত' বলা যাইতে পারে না। তিনি তাঁহার উক্তির পক্ষে দুইটা যুক্তি দিয়াছিলেন। প্রথম যুক্তি এই যে, সঙ্গীতটার জন্ম মুস্‌লিম বিদ্বেষ হইতে; বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র অন্যতম প্রধান 'সন্তান' ভবানন্দের মুখ দিয়া উহা গাওয়াইয়াছেন; এই সন্তানদের ব্রত ছিল 'নেড়ে মাতালদিগকে' এদেশ হইতে 'মেরে তাড়ানো'; সুতরাং এই সঙ্গীতে মুস্‌লিম-বিদ্বেষের গন্ধ আছে। মিঃ

সরকারের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতাপূর্ণ ; সুতরাং যে বাঙ্গলাদেশের শতকরা পঞ্চান্ন জন অধিবাসী একেশ্বরবাদী মুসলমান, সে দেশের 'জাতীয় সঙ্গীত'রূপে ইহাকে চালানো যাইতে পারে না।

মিঃ সরকারের উক্তির প্রতিবাদ অনেক সংবাদ-পত্রেই করা হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও উহার প্রতিবাদ করিবার জন্য কলম ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের যুক্তির সার-মর্ম্ম এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র 'সন্তান'দের বিদ্রোহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নহে—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের চিরন্তন বিদ্রোহ ; সুতরাং এই সঙ্গীতে মুস্‌লিম-বিদ্বেষের কথা উঠিতে পারে না। আর এই সঙ্গীত বাহ্যতঃ দুর্গার স্তুতি হইলেও আসলে উহা দেশমাতৃকারই বন্দনা ; সুতরাং জাতি-ধর্ম্ম-স্থান-কাল-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষই এই সঙ্গীতটীকে তাহাদের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে গ্রহণ করিতে পারে।

হিন্দু ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই পর্য্যন্ত বাদ-প্রতিবাদ হইয়াই ব্যাপারটার উপর ধামাচাপা পড়িয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ হইতে উহার উপর ধামাচাপা পড়া উচিৎ নহে। যে-সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন হইতে দূরে দাঁড়াইয়া সরকারের তোষামোদ করিয়াই ইসলামের উন্নতি করিবেন, জাতীয় সঙ্গীত লইয়া তাঁহাদের কোনও মাথা ব্যথা হইবার কথা নহে। কারণ তাঁহারা Rule Britania এবং God save the King গাহিয়াই ইসলামের ইজ্জত রক্ষা করিবেন। আর যাঁহারা কাবুল-তুর্কীর সাহায্যে ভারতে মুসলিম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুদের উপর আবার বাদশাহী করিবেন স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারাও জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিবেন না। কারণ মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠা হইলে এ দেশের ভাষা ত আর তাঁহারা বাঙ্গলা রাখিবেন না। সুতরাং যাঁহারা হিন্দুদের সহিত এদেশে একত্রে বাস করিবেন, তাঁহাদেরই কেবল একটা জাতীয় সঙ্গীতের আবশ্যকতা আছে। জাতীয় সঙ্গীত কি হওয়া উচিৎ-অনুচিৎ, এখন হইতে হিন্দুর সহিত আলোচনা করিয়া তাহা স্থির করা উচিত। কংগ্রেসের মধ্যবর্ত্তিতায় ভারতের যে জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষেই উহা গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। জাতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা উচিৎ।

'বন্দেমাতর'ম্ নামক যে সঙ্গীতটীকে বর্ত্তমানে সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 'জাতীয়সঙ্গীত' রূপে ব্যবহার করা হইতেছে, তার বিরুদ্ধে মিঃ সরকার যে-যুক্তি দিয়াছেন, আমরা আশা করি, দেশ-হিতকামী এবং সাম্প্রদায়িক মিলনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই এ-বিষয়ে চিন্তা করা উচিত।

আমাদের মতে সঙ্গীতটীর গোড়ার কথা এবং অর্থ কোনও দিক দিয়াই উহা মুসলিম সমাজের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আর অর্থের দিক দিয়া উহা কেবল মুসলমানদেরই আপত্তিজনক নহে, ভারতীয় খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদেরও উহাতে আপত্তি আছে।

'আনন্দমঠে'র 'সন্তান'দের বিদ্রোহকে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের বিদ্রোহ বলিয়া উহাকে একটা চিরন্তনের রূপ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমরা এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠ' সৃষ্টির মূলে তেমন সার্ব্বজনীন আদর্শ থাকিলে তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ব্যাপারটাকেই তাঁহার আখ্যানবস্তু করিতেন না। পাঠান ও মোগলসম্রাটদের বিরুদ্ধে এই বাঙ্গলাতেই হিন্দু-মুসলিম-মিশ্রিত অনেক বিদ্রোহ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর বিদ্রোহ এই সার্ব্বজনীন বিদ্রোহ হইলে তিনি এই সমস্ত ঘটনার কোনোটাকে তাঁহার আখ্যান-বস্তু করিতেন, এবং তাহার 'মঠে' অনেক মুসলমান স্থান পাইত; সম-অত্যাচারিত হিন্দু-মুসলিম অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে ('নেড়ে'দের বিরুদ্ধে নহে) অভিযান করিত। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি সঙ্কীর্ণ সৃষ্টি—উহাকে আজ জোর করিয়া সার্ব্বজনীনতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল। কাজেই 'আনন্দমঠে'র পাঠকদের মনে জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, একটা মুসলিম-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যাহাদের অতীত বা পূর্ব্ব-পুরুষ সম্বন্ধে হিন্দুর মনে অমন একটা বিদ্বেষ থাকিবে, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করা হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব হইবে। 'আনন্দমঠে'র 'সন্তান'দের গীত সঙ্গীত এ যুগের কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের মুখে পুরিয়া দেওয়া, আর তাহাদিগকে 'সন্তানী' ভাবে উদ্বুদ্ধ করা একই কথা। 'আনন্দমঠে'র 'বন্দেমাতরম'কে আমাদের সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে বাঁচাইয়া রাখার অর্থই সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকে চিরকালের জন্য জিয়াইয়া রাখা।

আর অর্থের দিক দিয়াও যে উহা মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের আপত্তিজনক, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সমস্ত

একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নিকট পৌত্তলিকতার উন্নত দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া লাভ নাই; তাহারা সে-সব যুক্তি মানিতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং কোনও দার্শনিক হিন্দু ভ্রাতার পক্ষে সে-চেষ্টাও কর্ত্তব্য নহে।

জাতীয় সঙ্গীতের আবশ্যকতা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, এবং করি বলিয়াই 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটাকে সমস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার আমরা আশু আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নাই। ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ও গেয় একটা জাতীয় সঙ্গীত রচিত হইতে পারে না, তেমন কথা নয়। আর বর্ত্তমান সময়েও ভাব ও উদ্দীপনার দিক দিয়া 'বন্দেমাতরম' অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের স্বদেশ-সঙ্গীতও অনেক বিদ্যমান আছে। সে সমস্ত ছাড়িয়া 'বন্দেমাতরম'কেই জাতীয় সঙ্গীতরূপে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে যে অধিকাংশ হিন্দু ভালবাসে, তার কারণ তার পিছনে ঐ 'আনন্দ-মঠ'। এই মনোবৃত্তিই 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বর্জ্জনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি। আমরা সমস্ত জাতীয়তাবাদী দেশ-হিতকামীদিগকে এ-বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।"

৫ : ১০ ॥ জাতীয় সঙ্গীত

"আমরা গতসংখ্যা 'সওগাতে' বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক যে-সঙ্গীতটা আজকাল হিন্দুরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, উহাকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিতে মুসলমানদের আপত্তি আছে। সেই সঙ্গে আমরা ইহাও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, ঐ সঙ্গীতটাকে সমস্ত জাতীয় অনুষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তৎস্থানে অন্য জাতীয় সঙ্গীতের প্রবর্ত্তন করিবার জন্য প্রধানতঃ হিন্দুদেরই চেষ্টা করা উচিত।

কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা বা কোনও হিন্দু সংবাদপত্র আমাদের এই প্রস্তাব কানে তুলিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। একমাত্র 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে একজন লেখক এ-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলিয়াছেন। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের দোষ ক্রটী প্রদর্শন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়কে ইহার বিরুদ্ধে বিরূপ করিয়া দিয়া মিঃ এন্. এন্.

সরকার যে জাতীয়তার ঘোরতর ক্ষতি করিয়াছেন, লেখকের প্রধান বক্তব্য তাহাই। মিঃ সরকারের এই অবিমৃষ্যকারীতার জন্য তাঁহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিবার পর লেখক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, উক্ত সঙ্গীতের এখানে ওখানে দুই একটা শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে সর্ব্বসম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য করা হউক। সহযোগীর এই প্রস্তাব গ্রহণ-যোগ্য না হইলেও তিনি যে মুসলমানদের আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করিয়াছেন এবং একটা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাকে আমরা শত-সহস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কি মীমাংসা হইবে, তাহা আলোচনা আরম্ভ হইলেই বুঝা যাইবে। একবার আলোচনা আরম্ভ হইলেই উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। এই পরিচয়ই মীমাংসা সহজ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু এই বোঝা-পড়া করিবার আবশ্যকতা হিন্দু সম্প্রদায়ে সকল স্তরে উপলব্ধ হয় নাই। এক 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ছাড়া অন্য কোনও কাগজে এ-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা হইতেছে না। আমাদের উক্ত মন্তব্য প্রকাশের পর 'বন্দে মাতরমে'র প্রতি হিন্দুর টান যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আজকাল হিন্দুদের দ্বারা কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, এমন কোনও অনুষ্ঠান হয় না, যাহাতে এই 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত না হয়। আমাদের উক্ত মন্তব্য প্রকাশের পর বশীরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী হইয়া গেল। উহাতেও 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হইল। মুসলমানদের মনোভাবের কথা কোনও সদস্যের মুখ দিয়া বাহির হইল না। বশীরহাটে এই সঙ্গীতটা গীত হইবার সময় নাকি সমস্ত সভ্য-মণ্ডলীকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময় কোনও মুসলমান প্রতিনিধি কি তথায় উপস্থিত ছিলেন না? যদি থাকিয়া থাকেন, তবে দেখা যাইতেছে, তিনি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তির কথা হিন্দুদের নিকট নিবেদন করিবার পরিবর্ত্তে এই সঙ্গীতটীকে এবার নূতন সম্মান দিয়া আসিয়াছেন। যে সঙ্গীতটাকে কোনও অনুষ্ঠানে গীত হইতে দেওয়াইতেই মুসলমানদের আপত্তি আছে, সেই সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনহেতু মুসলমান প্রতিনিধি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা আমাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। মুসলমানদের মধ্যে কোনও কোনও লোক মৌলুদপাঠের সময় হজরতের রূহের প্রতি তাজিম প্রদর্শনহেতু কেয়াম করিয়া থাকে বলিয়া অধিকাংশ

মুসলমান এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া থাকে। অথচ মুসলিম-বিদ্বেষ-সঞ্জাত পৌত্তলিকতাপূর্ণ সঙ্গীত গান করিবার সময় (দুর্গাদেবীর অবতরণ উদ্দেশ্যেই বোধ হয়) উঠিয়া দাঁড়াইতে কংগ্রেসী মুসলমানদের ধর্ম্মবুদ্ধি বিন্দুমাত্র আহত হইল না। সমস্ত সভ্য জগৎ যখন সর্ব্বপ্রকারের পৌত্তলিক ভাবমুক্ত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, সেই যুগে তৌহিদের প্রবর্ত্তক মুসলমান দিন দিন পৌত্তলিক হইয়া যাইতেছে, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এই সঙ্গীত গাহিবার সময় যে-সমস্ত মুসলমান সভ্য বিনা-প্রতিবাদে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহা গলাধঃকরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নীরবতাকে যদি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের অনুমোদন বলিয়া হিন্দুসমাজ ভুল করেন, তবে তাহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। 'আনন্দমঠে'র 'বন্দে মাতরম'কে মুসলমান সমাজ কোন মতেই জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করিবে না, হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইহা স্থির জানিয়া রাখুন। আমরা আবার অনুরোধ করিতেছি, জাতীয়তাবাদী হিন্দু চিন্তানায়করা বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন।"

৫ : ১০ ॥ চৈত্র ১৩৩৪

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনী

"গত ইস্টারের ছুটীতে বশীরহাটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনীর ইহা চতুর্থ অধিবেশন। চট্টগ্রামে তৃতীয় অধিবেশনের পর দীর্ঘ দিন সম্মিলনী আহ্বানের কোনও চেষ্টা হয় নাই। এবার বশীর-হাটবাসী সম্মিলনী আহ্বান করিয়া বাঙ্গলার মুসলমান সমাজে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তজ্জন্য বশীরহাট-বাসী সমগ্র মুসলমান সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।

সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন প্রবীন সাহিত্যিক মওলানা মোহাম্মদ মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন 'নারীর-ধর্ম্মে'র লেখক উদীয়মান সাহিত্যিক মৌলবী সৈয়দ মোকার্‌রম আলী সাহেব। উভয়ের অভিভাষণই বেশ সময়োপযোগী হইয়াছিল। উভয়েই অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন।

মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব তদীয় অভিভাষণে যেসব কথা বলিয়াছেন, তার কোনও কোনও ব্যাপারে আমাদের মত-বিভিন্নতা আছে বটে, কিন্তু নিজের বক্তব্য-বিষয় তিনি বেশ গোছাইয়া বলিতে পারিয়াছেন।

সম্মিলনীর পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকদিন উপর্য্যুপরি ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় দূরবর্ত্তী স্থানের সাহিত্যিকগণ যোগদান করিতে পারেন নাই, সেজন্য সাহিত্যিক-সমাগম আশানুরূপ হয় নাই। তথাপি সম্মিলনী মোটের উপর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। আশা করা যায়, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ আগামী বারে অধিকতর উৎসাহের সহিত সম্মিলনী আহ্বানের প্রথা কায়েম করিবেন।"

৭ : ৯-১০, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

"মুসলমান সমাজে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। পূর্ব্বে যে-সকল পরিবারের লোকেরা বাঙ্গলা ভাষায় কথা বলাকে অগৌরবের কার্য্য মনে করিতেন, এখন তাঁহারাও সাগ্রহে বাঙ্গলা বই, সাময়িক পত্র প্রভৃতির পাঠ করিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদের অনেকে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গলাকে ঘৃণা করিতেন না, শুধু উপেক্ষা করিতেন, তাঁহারাও মাতৃভাষা-চর্চ্চার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। এ-সমস্তই সমাজের পক্ষে কল্যাণ-দ্যোতক। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের বহুল চর্চ্চা ব্যতীত কোনো সমাজ বা জাতির অভ্যুত্থান হইতে পারে না, ইহা অতি পুরাতন সত্য হইলেও মুসলমানদের কাছে ইহা যেন মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছিল। ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে যাঁহাদের সত্যবুদ্ধি আবার জাগ্রত হইয়াছে; আবার তাঁহারা ধ্বংসের পথ ছাড়িয়া কল্যাণের পথে আসিয়াছেন ও আসিতেছে।

কিন্তু মুসলমানদের নবজাগ্রত এই শুভবুদ্ধির মধ্যেও একটী বড় দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তরুণদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে নামিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; আমাদের নূতন লেখকদের মধ্যে অধিকাংশই কবিতা, গান, গল্প ও উপন্যাস রচনায় ইচ্ছুক, কিন্তু ২/১ জন ছাড়া আর কেহই তাহাতে তেমন কোনো শক্তির পরিচয় দিতে পারিতেছেন না। ইহার কারণ

কি? আমাদের মনে হয়, আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে অনেকে নিজেদের জন্য ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে ভুল করিতেছেন। কেহ হয়তো ভাবিতেছেন, অমুক যখন কবিতা-গান রচনা করিতেছেন তখন আমি-ই বা পারিবনা কেন? এইরূপ চিন্তা তাঁহাকে কবিতা ও গান রচনায় প্রবর্ত্তিত করিতেছে; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা যে সফল হইতেছে না, তাহা বুঝিবার মতো বুদ্ধি তাঁহার নাই। আবার কেহ হয়তো ভাবিতেছেন, অমুক গল্প বা উপন্যাস লিখিতেছেন, আমিই বা পারিব না কেন? যেরূপ ভাবনা, সেইরূপ কার্য্য। তিনি গল্প লিখিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি যে এ দিকে মোটেই নয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। এইভাবে, নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের তরুণ সাহিত্যব্রতীদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এ-দিকে সাহিত্যিক সমাজের আশু মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মানুষ সাধনা করিলে যে-কোনো ক্ষেত্রে কিছুনা-কিছু শক্তির পরিচয় দিতে পারে, ইহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু সাধনা বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদের তরুণ সাহিত্যব্রতী বন্ধুদের মধ্যে তাহার অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ... চেষ্টা করে তাহার স্বাভাবিক শক্তির গতি কোন্ দিকে, এবং নিজের সাধন-ক্ষেত্র নির্ব্বাচনে নিজের স্বাভাবিক শক্তির ইঙ্গিত গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা অনেকখানি বৰ্দ্ধিত হয়। কিন্তু আমাদের তরুণরা সাধারণতঃ তাহা করেন না। তাঁহারা নিজেদের তরুণোচিত সখগুলিকে স্বাভাবিক শক্তির প্ররোচনা বলিয়া ভুল করেন এবং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত বা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যর্থতার পথ অনুসরণ করেন। তরুণ সাহিত্যব্রতীদের এইরূপ মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথা তাঁহাদের নিজেদেরও সাফল্য লাভ হইবে না, মুসলমান সমাজও তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে না।

আর একটি কথা বলিয়া শেষ করি। আমাদের তরুণ বন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা গল্প, কবিতা প্রভৃতি লিখিতে যথেষ্ট শক্তি অনুভব করেন না, তাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিলে ভালো হয়। প্রবন্ধ লিখিতে হইলে অবশ্য যথেষ্ট সম্বল থাকা চাই, এবং এই সম্বল সংগ্রহ করিবার জন্য ভাবী লেখকদের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা চাই। বিভিন্ন বিষয়ে ভালো ভালো বই পড়া ও শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রগুলির সহিত নিবিড়

পরিচয় স্থাপন এজন্য বিশেষ আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে যে দুই একজন প্রবন্ধ লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে গভীর ও সুশৃঙ্খল চিন্তার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের এ ত্রুটী ঘুচাইবার জন্য যথেষ্ট সাধনা করিতে হইবে।

আমাদের এ সব মন্তব্যের উদ্দেশ্য তরুণ সাহিত্যব্রতীদের নিন্দা করা বা নিরুৎসাহ করা নয়। আমরা চাই তাঁহারা যাহাতে সাহিত্যের সকল শাখায় শক্তির পরিচয় দিতে পারেন, সেজন্য সাধনায় ব্রতী হউন। তৃতীয় শ্রেণীর লেখক হইয়া খুশী থাকিতে ইচ্ছা হওয়া কাহারো পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়, সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর নয়।"

২ : ৮-১১, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩২৭

নবীন সাহিত্যিক

"আজকাল অনেক নবীন সাহিত্যিক দেখা দিয়াছেন, ইহা খুব আশার কথা। বাঙলা সাহিত্যের মুসলমানের দিকটাকে আগাইয়া দিবার জন্য ইঁহাদের সকলের প্রাণে একটা আকুল আগ্রহ জাগিয়াছে। দেখা যাইতেছে যিনি যত রকমে পারিতেছেন সাহিত্যের অঙ্গ-পুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই নবীনদের সাহিত্যের আসরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নেওয়ার দরকার।

ইহাও দেখিতে হইবে যে নবীন সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত প্রতিভা যে যে ক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করিতে পারিবে তাহা ছাড়াইয়া অন্য দিকে না যায়। আজকাল অনেকেই এই অভিযোগ করেন—এবং সে অভিযোগ ঠিকও—যে, নবীন মুসলমান লেখকগণ গদ্য ছাড়িয়া পদ্য লেখার দিকে ঝোঁক দিতেছেন খুব বেশী; অথচ মুসলমানদের হাত দিয়া কবিতা বাহির হইতেছে খুবই কম।

ইহার বেশ পরিষ্কার একটা অর্থ আছে। গদ্য লেখার চেয়ে পদ্য লেখায় পরিসর এবং চিন্তার দিক দিয়া খাটুনী অনেক কম। ছন্দের বাপের চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়াও কোনো রকমে একটু মিল-ঝিল রাখিয়া কোনো একটা বিশেষ ভাব নিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়া দিতে পারিলেই একটা পদ্য হইয়া গেল। কিন্তু গদ্য লেখায় তাহা করিলে চলিবে না। তাহাতে অনেক চিন্তা, অনেক ভাব অনেকটা খাটুনী চাই।

পদ্য ঝুড়ি ঝুড়ি লেখা হইতেছে। তার আধ আনা আন্দাজ ছাপার অক্ষরে সাময়িকের পৃষ্ঠায় বাহির হয়, আর সাড়ে পনের আনা বাজে কাগজের চুপড়ীতে গিয়া পড়িতেছে। যাহা বাহির হইতেছে তাহার মধ্যেও কবিতা একেবারে কম, পদ্য খুব বেশী—তা'ও এমন পদ্য যার সঙ্গে ছন্দের বিশেষ বন্ধুতা নাই।

কবিতা অর্থ পদ্য হয়তো হইতে পারে কিন্তু পদ্য অর্থ কবিতা নহে। কবিতা সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি—পদ্য অক্ষরে-অক্ষরে মিল দেওয়া কথা। নবীনদের এই তফাৎ ভুলিলে চলিবে না।

যাহার অন্তরে সৌন্দর্য্যের খনি নাই সে পদ্য লিখিলেও লিখিতে পারে, কবিতা লিখিবে কি প্রকারে? কবির কাজ কি? কয়েকটা বাছা বাছা কথার ঘা দিয়া লোকের মনের সামনে একখানা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যপট খুলিয়া ধরা। যাহার অন্তরে সৌন্দর্য্যের উৎস নাই সে তাহা দেখাইবে কি করিয়া? যাঁহারা নূতন সাহিত্য-চর্চ্চায় ব্রতী হইতেছেন তাঁহাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

ভাব কবিতার প্রাণ;—ছন্দ অন্ততঃ পক্ষে দেহ। এ ছন্দকে উপেক্ষা করা চলে না। সে যদি বশবর্ত্তী না হয়, তবে তাহার ঘাড়ে লাঠি মারিলে ঔষধ দেওয়া হয় না। কারণ সে মূর্খ নয়।

ইচ্ছা হইলেই কবিতা লিখিতে যাওয়া উচিত নয়; অন্ততঃ লিখিয়া তাহা ছাপার অক্ষরে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। গদ্য লেখাও সাহিত্য এবং তাহাই 'প্রবলতর' সাহিত্য। তাহাতেই কীর্ত্তিমান হওয়ার চেষ্টা নবীন ব্রতীরা করুন।

গদ্যেও হাত দেখাইবার ক্ষেত্র যথেষ্ট রহিয়াছে। একটা ছন্দ, একটা তাল, একটা ক্রম ইহাতেও রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। গদ্য লেখার ভিতর চিন্তা ও ভাব এখানে সেখানে ছড়ানো থাকিলে চলিবে না। ক্রমশঃ-সূক্ষ্ম কোন শিকলে যেমন কড়াগুলি পর পর বসানো থাকে তেমনি ইহার ভিতরেও চিন্তার ধারা একটা স্পষ্ট ছন্দ রক্ষা করে। তাহা ভঙ্গ হইলে পদ্যের চেয়ে গদ্যের কম দুর্দ্দশা হয় না।

সাধনায় ব্রতী হইবার সময় এই রকম ছোট বড় অনেক কথা নবীন-দের স্মরণ করিতে হইবে।"

৪ : ১, আষাঢ় ১৩৩৩

মরহুম কাজি ইমদাদুল হক

"কাজি ইমদাদুল হক বি. এ., বি. টি., সাহেব আর ইহজগতে নাই। গত কয়েক বৎসর হইতে তিনি নানাবিধ জটিল পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কোনোরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ডাক্তারী চিকিৎসায় তেমন সুফল হইবে না মনে করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে তিনি কলিকাতায় হাকিমী চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহাতে কিছু সুফলও দেখা গিয়াছিল। কিন্তু যাঁহার কাল ফুরাইয়াছে, চিকিৎসায় তাঁহার কি ফললাভ হইবে ?

মরহুম কাজি ইমদাদুল হক বি. এ. ও বি. টী. পাশ করিয়া বিভিন্ন সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন; এবং কিছুকাল পরে স্কুল-ইনস্পেক্টর পদে বৃত হন। শেষোক্ত পদে কিছুদিন কার্য্য করিবার পর তিনি কলিকাতা গবর্ণমেন্ট নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্‌মাস্টার হইয়া আসেন। এখানে উদার, সদয় ব্যবহারের ফলে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকল ছাত্রের অকৃত্রিম ভক্তি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তত্রত্য ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। রোগক্লিষ্ট দেহ লইয়াও এই কার্য্য তিনি একান্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন।

মরহুম কাজি সাহেব আজীবন একনিষ্ঠতার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মক্তব ও স্কুল-পাঠ্য বহু পুস্তকের রচয়িতা। তাঁহার লিখিত "নবী কাহিনী" ও "প্রবন্ধমালা" পাঠ করিলে তাঁহার লিপিকুশলতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার মুসলমান সমাজ অথবা মুসলমান সমাজের নেতৃবর্গ যখন অস্বাভাবিক উর্দ্দু-প্রীতির পরিচয় দিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষার আসন হইতে দূরে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন যে সকল দূরদর্শী ব্যক্তি এবংবিধ প্রচেষ্টার ঘোর অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য সেবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন ও তদ্বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, মরহুম কাজি সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। আজ মুসলমান সমাজে বাঙ্গালা-সাহিত্য সেবী লেখক ও কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু এমনও এক সময় গিয়াছে, যখন বাঙ্গালা ভাষা ও

সাহিত্যের সেবার পরিবর্তে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ ভিন্ন অন্য কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। এ হেন যুগে মরহুম কাজি ইমদাদুল হক মাতৃ-সাহিত্য সেবার আদর্শ স্থাপন করিয়া যুগপৎ যেরূপ দূরদর্শন ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত সাধারণ নহে। বঙ্গ-ভাষা-ভাষী মুসলমান সমাজ এজন্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

মরহুম কাজি সাহেব ধর্ম্ম বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতেন। তিনি অত্যধিক পর্দ্দার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রচলিত প্রথা ও মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার মত মানসিক বল তাঁহার ছিল, এই ব্যাপারেও তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।"

৪ : ১, আষাঢ় ১৩৩৩

মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থির করিয়াছেন, আগামী জুলাই মাসে তাঁহারা একটী সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান করিবেন। এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী আহুত হওয়ার পর অন্য কোথাও ঐ সম্মিলনী বসে নাই। এ বৎসর যদি সত্য সত্যই সাহিত্য সম্মিলনী হয়, তবে বড় আনন্দের বিষয় হইবে। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পূর্ব্ব হইতেই সেই জন্য উদ্যোগ আয়োজন, বিজ্ঞাপন প্রচার প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন না কেন? সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে চাকুরীজীবী; সুতরাং কোন সরকারী অবকাশের সময় সম্মিলনী আহ্বান করিলে অধিক সাফল্য ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু জুলাই মাসে সেরূপ অবকাশ তো দেখিতেছিনা। আশা করি, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি এ বিষয় চিন্তা করিবেন।"

৪ : ৩, ভাদ্র ১৩৩৩

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

"গত ৩১শে জুলাই (১৯২৬) তারিখে কলিকাতা ২৯নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ মোহাম্মদ লায়েক জুবিলী ইনষ্টিটিশন হলে ব্যারিষ্টার মিঃ এস্. ওয়াজেদ আলি সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির

বাষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষার বাহনস্বরূপে গৃহীত হওয়ায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এই সভা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এই সভার মতে এই ব্যবস্থা বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদিগের বিদ্যাচর্চ্চা ও চিন্তাশক্তির উন্মেষের পক্ষে অতীব কল্যাণপ্রদ হইবে।

২। বঙ্গ সাহিত্য যাহাতে সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট এবং সমগ্র বাঙ্গালী জীবন ও মনোভাবের স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি হয়, তদুদ্দেশ্যে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এই সভা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন যে:—

(ক) মুসলমান গ্রন্থকারগণের রচিত ইসলামী ভাবধারায় প্রকাশিত উৎকৃষ্ট পুস্তকসমূহ যথেষ্ট সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হউক।

(খ) আরবী-ফারসীজাত যে সমস্ত শব্দ মুসলমানদিগের বিশিষ্ট রুচিগত ও ধর্ম্মগত ভাবের পরিচায়ক এবং এই শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ তাঁহারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন, মুসলমান পরীক্ষার্থীগণ যাহাতে ঐ সমস্ত শব্দ পরীক্ষার উত্তরপত্রে অবাধে ব্যবহার করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হোক, এবং তদনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণকে উক্ত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করা হোক।

৩। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিগত বীরভূম অধিবেশনে মৌলবী গোলাম মোস্তফা সাহেবের প্রস্তাবমতেও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্ব্বাচিত পাঠ্য পুস্তকসমূহে ইসলামী বিষয়ের অধিকতর সমাবেশ করিতে এবং মুসলমান পরীক্ষার্থীদিগকে তাহাদের অপরিহার্য্য আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের অবাধ অধিকার দিতে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এই সভা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিতেছে।"

৫ : ৩, ভাদ্র ১৩৩৪

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ

"বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় গত ১৮ই আষাঢ় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া বাঁকুড়া জিলার তদীয় পল্লীনিবাসে ৫৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রসায়ন-শাস্ত্রে এম. এ. পাশ করিয়া অধ্যাপনায় জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার ইচ্ছার ঐকান্তিকতাবশতঃ তিনি আধ্যাপনা পরিত্যাগ করেন।

তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তার অধিকাংশই নাটক। তাঁহার 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর', 'ভীষ্ম' ও 'নর-নারায়ণ' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার নাটকগুলি কেবল সাহিত্য হিসাবেই সফলতা লাভ করে নাই, রঙ্গমঞ্চেও তাহারা দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে পর্য্যন্তও তিনি নিতান্ত 'সেকেলে' হইয়া যান নাই, আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও উৎকৃষ্ট দান করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার ছিল, তার প্রমাণ 'নর-নারায়ণ'। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা সাহিত্য বিশেষতঃ বাঙ্গলা রঙ্গ-মঞ্চের যে ক্ষতি হইয়াছে, সহজে তাহার ক্ষতিপূরণের কোনও সম্ভাবনা নাই।"

কবিবর যোগীন্দ্র বসু

"সুপ্রসিদ্ধ কবি ও জীবনী-লেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইনিও শিক্ষকতায় জীবনারম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মাইকেলের জীবনী লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তিনি এই গ্রন্থে ইউরোপীয় জীবনী-লেখকদের অনুসরণে তীক্ষ্ণ সমালোচনার দৃষ্টিতে সাহিত্যিকের জীবনী লিখিবার এক উৎকৃষ্ট ও বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনব পথ প্রদর্শন করেন। মাইকেলের জীবনী বাঙ্গলা সাহিত্যে এক মূল্যবান গ্রন্থ।

সাহিত্য-সাধক ব্যতীত যোগীন্দ্র বাবু একজন সেবাব্রত মানব-প্রেমিকও ছিলেন। তিনি বৈদ্যনাথের কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করিবার সময় তথায় এক কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।"

৭ : ৫ পৌষ ১৩৩৬

কবি-সম্বর্দ্ধনা

"গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে কবি নজরুল ইসলামকে স-সমারোহে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সভারম্ভের অনেক পূর্ব্বেই গৃহটী জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অনুরাগী শত শত ভদ্রলোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সভায় বহু সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী এবং কয়েকজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বেলা ঠিক দুইটার সময় একখানি পুষ্প-সজ্জিত মোটর-কারে করিয়া কবিকে সভায় আনা হয়; তিনি সভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাত্র উপস্থিত জন-মণ্ডলী জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

সভারম্ভে প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম. এ, নজরুল ইসলামের

চল্ চল্ চল্
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল...

গানটি গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"আজ বাঙ্গলার কবিকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙ্গলা দেশ সম্মোহিত হইয়া আছে। তাই অন্যের প্রতিভা লোক-চক্ষে তেমন করিয়া ধরা পড়িতেছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দুই জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকারের মৌলিকতার সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহারা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি— প্রতিভাবান মৌলিক কবি! রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নাই; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ আমি এই ভাবিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গালীর কবি! কবি মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে শুধু বাঙ্গালী রূপেই পাইয়াছিল। আজ

নজরুল ইসলামকেও জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তাহা নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরিয়া বুকের রক্ত দিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে।”

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতার পর “নজরুল সম্বর্দ্ধনা সমিতির” সভাপতি মিঃ এস. ওয়াজেদ আলি নিম্নোদ্ধৃত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন :—

অভিনন্দন পত্র

কবি,

নজরুল ইসলাম—

করকমলেষু

কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব্ব অবদানে বাঙালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতাসিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের ঊর্দ্ধে—সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগ্‌লা-ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোত ধারায় বাঙালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও!

বাঙলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্ব্বাক্-বন্দনা গ্রহণ কর!

তুমি বাঙালীর ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ; মূর্চ্ছাতুর প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ-ধারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে:—তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ অভিবাদনে তুমি নয়নপাত কর!

তুমি বাঙ্‌লার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কন্ঠে ইরানের গুল-বাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ; রসালের কণ্ঠে সহকার-সাথে আঙুল-লতিকার বাহু-বন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরানী সাকীর লাল শিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত-নিবেদন গ্রহণ কর!

ধূলার আসনে বসিয়া মাটীর মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে-গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন-সায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথা পিয়ে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার— মানুষের নমস্কার!

গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে
নজরুল-সম্বর্দ্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ।
কলিকাতা, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯।

উপহার দ্রব্য

অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইলে সভাপতি মহাশয় জনতার করতালি-ধ্বনির মধ্যে কবিকে সোনার দোয়াত-কলম ও রূপার চোঙায় (casket-এ) অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন।

অতঃপর শ্রীযুত উমাপদ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক কবির অভিনন্দনের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি আবাহন-সঙ্গীত গান করেন। সঙ্গীতটী এই:—

ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সরসীতে তুমি
সুন্দর সিত শতদল।
সঞ্চরে শ্যাম-সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা-পরিমল॥
দুর্য্যোগে ভরা তমসার রাত,
তোমার প্রকাশে লভিল প্রভাত,
অরুণের রাগে পরাগে পরাগে
রক্তিম তব হিয়া-তল॥

অনুদিন তট-বন্ধন-হারা
গভীর জীবনে ব্যাপিয়া,
প্রতিভা প্রভায় উঠিয়াছ তুমি
জীবনের পরে ছাপিয়া,
ঝঞ্ঝা যখন বহিল অধীর,—
তুমি অশান্ত, তুমি অথির ;
কণ্টক যবে বিঁধেছে তোমারে
স'য়েছ নীরবে অচপল ॥

অন্তবিহীন কান্ত রবি সে,—
নাহিক তোমারো অবসান,
বিকচ তোমার সুরভির সুরে
বিচিত্র তব অবদান ;
তোমারে সবার সম-অধিকার,
ভারতীর তুমি শুভ-উপচার,
সখ্যে তোমার কত না মরাল
পক্ষে ঢাকিল কালো জল।
হে শুচিস্মিত, শুভ্র-কোমল,
সুরভি-স্নিগ্ধ শতদল !

সঙ্গীতের পর নজরুল ইসলাম অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিলে সভাস্থ জন-মণ্ডলী বিপুল জয়োল্লাসে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উত্তরটী এই :—

কবির উত্তর

বন্ধুগণ !

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তু'লে দিলেন, আমি তা মাথায় তু'লে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে ?

আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠ্‌ল! নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বল্‌তে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা কর্‌বেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না-চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুন্‌তে পাবেন।

আজ বল্‌বার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজকের দিন যে হারিয়ে দিতে পার্‌ব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজ-কুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচু'নে-মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজ্‌কের দিন তাকে নাচ্‌তে বল্‌বেন না।

আজ হয়ত সত্যি সত্যিই আমার অভিনন্দন হ'য়ে গেল। এ শুধু আপনাদের—যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বল্‌ছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বল্‌ছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী করেই স্মরণ করছেন;—ফুল ফুটানোর চেয়ে হুল-ফুটানোতেই যাঁদের আনন্দ!

ওদিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশী রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পান্‌সে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই ক'রে জড়িয়ে ধর্‌তে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরেও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন কর্‌ছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুল-পাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অবন্ধুর দল তেমনি নিন্দার পর নিন্দার ধুলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টল্‌তে হয় নি!

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যে দিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই "ভালো লেগেছে"-টাকে ভালো করে বল্‌তে পারার এই উৎসবে আমার আজকে একটী মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ ক'রে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি কর্‌বেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সভার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক ব'লেই যদি আমায় ধ'রে এনে শাস্তির ব্যবস্থা ক'রে থাকেন, তা হ'লে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধ'রে এনে তাকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।···

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্যি সত্যিই আমি ভালো মানুষ ! কোনো অনাসিষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। পড়-পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে কর্ম্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়; অন্যায় তার—যে ঐ পড়-পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশ-জনের প্রাণ-নাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

আমাকে বিদ্রোহী ব'লে খাম্‌খা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচ্‌ড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকে মরণ তাদের তাড়া ক'রে নিয়ে ফির্‌ছে ! আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ্‌ সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠ্‌তে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র Beauty is Truth, Truth is Beauty.

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে,—কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি; আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি'। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা

সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি; সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই!—এই আশীর্ব্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্য্য-বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর-দশন শার্দ্দূল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দশনের ক্ষত আজো আমার অঙ্গে-অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব!

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যে দিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ব্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না ব'লে—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি ব'লেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তব-গানই আমার উপাসনা আমার ধর্ম্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্ম যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের উর্দ্ধে উ'ঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনো দিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেইটুকুই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠ্যাঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পার্‌বেনা। উল্টো ঐ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে!...

যৌবনের রক্ত-শিখা মশাল ধ'রে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বর-যাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ

করেন, তাঁরা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদ্দার রূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্ত্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি'। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আস্‌ব ঐ মেলায় শাহজাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্ম ফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্ত্তিতে, ব্যথিত পায়ে চ'লে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধ কূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধ'রে এনে হ্যাণ্ডশেক্ করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাত-মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তা হলে ওরা আপনি আলাদা হ'য়ে যাবে। আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাট্‌তে তাদের কোন বেগ পেতে হবেনা। কেন না, এক জনের হাতে আছে লাঠি আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।...

বর্ত্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলো-বালি, এত ধোঁওয়া এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্ত্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভ্‌বে, আমিও মর্‌ব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয়, তা হ'লে ঐ সমুদ্র মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্দ্ধেক দোষ এর দেবতা-দের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন-ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা —র'সে খান, অমৃত আছে। সে উঠ্‌ল বলে!

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হ'তে এসেছি আজ। আপনাদেরে আমার অজস্র ধন্যবাদ !

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা

কবির উত্তর পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত একটী সময়োপযোগী গান করেন। তারপর শ্রীযুত উমাপদ ভট্টাচার্য্য কবির রচিত 'পরদেশী বঁধুয়া' গজলটী গান করেন।

অতঃপর সভাপতির অনুরোধে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন। :—

"স্বাধীন দেশে জীবনের সহিত সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তাহা নাই। দেশ পরাধীন বলিয়া এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না। নজরুলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব—কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন; কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়ে ছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বে-রসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়—এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব—

তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে! আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াই; বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু"র মত প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির!"

সুভাষ বাবুর পরে রায় বাহাদুর জলধর সেন বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"আজিকার এই দিনে আমরা কবি নজরুল ইসলামকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য যে-ভাবে হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়াছি, জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, দেশের প্রত্যেক মঙ্গল-আয়োজনে যদি সেই ভাবে আমরা মিলিতে পারি; যদি ভুলিয়া যাইতে পারি, আমরা হিন্দু বা আমরা মুসলমান; শুধুই যদি আমাদের মনে জাগে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গলা মায়ের সন্তান, তবে আমাদের নজরুল-সম্বর্দ্ধনা সার্থক হইবে।"

উপসংহার

সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র উপসংহারে বলেন, "আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সংগীত কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীমান সুভাষের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করিব। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়িতেছিলাম। তাহাতে লেখা দেখিলাম, সে-সময় প্রত্যেক মানুষ অতি-মানুষে পরিণত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক-একটী অতিমানুষে পরিণত হইবে।"

অতঃপর সভাপতি, সুভাষ বাবু ও সমবেত জন-মণ্ডলীর অনুরোধ-ক্রমে কবি "টলমল টলমল···চল সমরে" ও "দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু"—এই দুইটি স্বরচিত জাতীয়সঙ্গীত গান করেন। গান শেষ হইলে সভাপতি আচার্য্য রায় আবেগ ভরে কবিকে আলিঙ্গন করেন।

সর্ব্বশেষে মিঃ জালালুদ্দীন হাশেমী কর্ত্তৃক সভাপতি ও সমবেত জন-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সোল্লাস জয়ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।"

৯ : ২, আশ্বিন ১৩৩৯

শরৎ-সম্বর্দ্ধনা

"বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পী, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের ছাপ্পান্ন বৎসর বয়স অতিক্রম উপলক্ষে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য বিগত ৩১শে ভাদ্র তারিখে কলিকাতার টাউন হলে বিরাট আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু দেশের রাজনীতিক পরি-স্থিতির জন্য ঐ তারিখে সম্বর্দ্ধনা সভা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং বিগত ২রা আশ্বিন রবিবার শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সম্বর্দ্ধনা সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতার নাগরিকগণ এবং বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য-সেবী ও ছাত্র-ছাত্রিগণ বিপুল উৎসাহের সহিত টাউনহলে সমবেত হইয়াছিলেন। উদ্বো-ধন সঙ্গীতের পর সুকবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবী মহিলাদের পক্ষ হইতে একটী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন, তাহার দু'ই একটী স্থান উদ্ধৃত করা হইল :—

..."শরতের পূর্ণচন্দ্রের অফুরন্ত জ্যোৎস্না ... তোমার কথা সাহিত্যের কনক কৌমুদী শুধু নরনারীর মর্ম্মে সুগভীর আনন্দ-বেদনার বিচিত্র তরঙ্গ তুলিয়াছে। তোমার প্রাণবন্ত সৃষ্টি তাহাদের দীর্ঘ তন্দ্রাহত অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছে, স্পন্দিত করিয়াছে, সঞ্জীবিত করিয়াছে। হে বাংলার কথা-সাহিত্যের অসামান্য শিল্পী ! আমরা তোমার বন্দনা করি।

পরাধীন বাংলার অধঃপতিত সমাজের অসহায় অন্তঃপুরচারিণীদের অন্তরের মূক আনন্দ বেদনাকে তুমি ভাষায় মূর্ত্ত করিয়া ধরিয়াছ। তাহাদের দুর্গত জীবনের সকল দুঃখসুখের অনুভূতিগুলিকে নিবিড় সহানুভূতির পরম রসরাগে সাহিত্যে বাস্তবরূপে সত্য করিয়া তুলিয়াছ। তোমার অনাবিষ্ট দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, সুগভীর উপলব্ধিশক্তি, বিচিত্র মানব-চরিত্রের অতল অভিজ্ঞতা—নিখিল নারী-চিত্তের নিগূঢ় প্রকৃতির গোপনতম সন্ধান লাভ করিয়াছে। হে নারী-চরিত্রের নিবিড় রহস্য-জ্ঞাতা ! আমরা তোমার বন্দনা করি !"

অতঃপর নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র মহাশয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন।—

"হে দুঃখ-বেদনার রহস্যবিৎ! বঞ্চিত স্নেহ এবং উপেক্ষিত প্রেমের নির্দ্দয় আঘাতে বিপর্য্যস্তা বঙ্গ-নারীর সংযত ধৈর্য্যের, মহিমাকে তুমি বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে বসাইয়া মহীয়সী করিয়াছ। পৌরুষহীন সমাজের অচেতন মনকে তুমি তার বিগত গৌরবের মূঢ় মোহ হইতে জাগ্রত করিয়াছ। আমাদের জীবনের যত কিছু সঞ্চিত লজ্জা, অপমান ও উৎপীড়নের ব্যথাকে তুমি কেবল ভাষা দাও নাই, আশা দিয়াছ; তোমার প্রতিভার আলোকে বাঙ্গালী নিজের পরিচয় পাইয়াছে।

হে ঐন্দ্রজালিক শিল্পী! অতি সাধারণ বাঙ্গালী জীবনের বিক্ষিপ্ত ও অকিঞ্চিৎকর উপকরণ লইয়াই তুমি স্বকীয় মৌলিকতায় স্বতন্ত্র, অনস্বাদিত-পূর্ব্ব, ভাবরস-সমৃদ্ধ যে কথা-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছ,—কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহে, তাহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অক্ষয় সম্পদরূপে অভিনন্দিত হইবে।"...

উভয় অভিনন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন—"৩১শে ভাদ্র আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ গ্রহণের আহ্বান আমার স্বদেশের আপনজনের কাছ থেকে প্রতিবৎসরই আসে; আমি শ্রদ্ধানত শিরে এসে দাঁড়াই; অঞ্জলি ভরে আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাড়ী যাই,— সে আমার সারা বছরের পাথেয়।

...আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছ থেকে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম,—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশী।

আজকের দিনে আমার সব চেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ। ঋণ কি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পূজনীয় সাহিত্যাচর্যগণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,— এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালীশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে ... তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়বস্তু ও বক্তব্য

আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, সল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আমি আজও সত্যভ্রষ্ট করিনি।"

ছাত্র-ছাত্রী সমাজের অভিনন্দন

বিগত ১লা আশ্বিন রবিবার ছাত্র-ছাত্রী-পরিষদ কলিকাতার সিনেট হলে শরৎ-সম্বর্ধনার সুন্দর আয়োজন করিয়াছিলেন। হলটী চমৎকারভাবে সাজানো হইয়াছিল এবং ছাত্র-ছাত্রী ও নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে সভাস্থলটা পূর্ণ হইয়াছিল।

ছাত্র-ছাত্রীগণ তাঁহাদের অভিনন্দনে বলেন—

"হে বন্ধু, তোমার সপ্তপঞ্চাশৎ জন্মদিনে বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীর প্রণাম গ্রহণ কর।

...তুমি কীর্ত্তিমান হইয়াও খ্যাতিতে আসক্ত নও, তেজস্বী হইয়াও নিরভিমান, শ্রদ্ধার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও নিরহঙ্কার! সত্য ভাষণে তোমার কুণ্ঠা নাই, দৃষ্টিতে আবিলতা নাই, দেশবাসীর প্রিয় হইবার গ্লানিকর চেষ্টা হইতে তুমি আপনাকে মুক্ত করিয়াছ।

যে বিচিত্র জীবনের সন্ধান তোমার লেখনীতে বাঙলার তরুণ পাইয়াছে, তাহারই আহবানে সে আজ দুঃখের অভিসার যাত্রায় জগৎ সমাজে তাহার পথের দাবী লইয়া দাঁড়াইবে। বাঙালীর জাতীয় প্রগতির সঙ্গে তোমার এই নাড়ীর যোগ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, তাহাই প্রার্থনা করি।

...আজ বাঙালীর সাহিত্যে, রাষ্ট্রে, সমাজে, কৃষ্টিতে নূতনের ভাববিপ্লব উপস্থিত। তোমার লেখনী এই জাতীয় ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে আবার কোন নতুন পথের সন্ধান দিবে তাহার আশায় সমগ্র ছাত্র-সমাজ উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।"

ছাত্র ছাত্রীদের অভিন্দনের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন—"আমর তরুণ বন্ধুগণ! আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ আমি আজ লাভ ক'রলাম —আমি তোমাদের চিত্তলোকে স্থান পেয়েছি, তোমরা আমাকে ভালবেসেছ। আমার সাহিত্য-সেবার এর চেয়ে বড় পুরস্কারের কথা কল্পনা করতে পারিনে। যে তরুণশক্তি যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীকে নূতন

ক'রে গঠন করে, দৃষ্টি যাদের প্রসারিত, অন্যায় বন্ধন যারা মানে না, বড় মন নিয়ে সর্ব্বত্যাগের বাণীকে অবলম্বন করে যারা যে কোন মুহূর্ত্তে হাসিমুখে পৃথিবীর বন্ধুরতম পথে যাত্রা করতে পারে, তারা আজ আমাকে তাদের আপনার জন বলে স্বীকার করেছে, এ আনন্দের স্মৃতি আমার চিরজীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল।"

৯ : ৫ পৌষ ১৩৩৯

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন

গত ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৯ টার সময় কলিকাতার এলবার্ট-হলে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত মূল-অধিবেশনে বাঙ্গলার বিশিষ্ট মুসলমান সাহিত্যিকগণ ও কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনে বহু মুসলমান মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রথিতযশা কবি কায়কোবাদ সাহেব মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, কবি নজরুল "এস এস রসলোকবিহারী এস মধুকর দল।" এই সঙ্গীত দ্বারা অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। অতঃপর কবি সাহাদাৎ হোসেন একটি সুমধুর কবিতাদ্বারা সমাগত সাহিত্যিকগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মওলানা আক্রাম খান, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে না পারিয়া অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া নিম্নরূপ এক পত্র দিয়াছিলেন :—

"আপনাদের পত্র টেলিগ্রাম পাইয়াছি। কলিকাতায় সাহিত্যেসেবক-গণের সম্মেলন হইতেছে, তাহাতে যোগদান করা আমার কর্ত্তব্য ছিল। আশাকরি, আমার শরীরের অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনারা এই দীন সেবককে ক্ষমা করিবেন। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা আল্লাহতালার হুজুরে সম্মে-লনের পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি। বর্ত্তমানের চিন্তানায়ক ও সাহিত্য-সাধক আপনারাই বাঙ্গলা ও আসামের তিন কোটী মুসলমানের অগ্র-পথিক এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ-জীবন-মরণের জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

দূর-প্রবাস হইতে প্রার্থনা করিতেছি—আপনাদের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হউক, অনাগত যাত্রীদের জন্য অগ্রগতির প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া, কল্যাণ-মণ্ডিত গতিপথের নির্দ্দেশ দিয়া, আপনারা আল্লাহ্‌র অনন্ত আশীর্ব্বাদ-ভাজন হউন।" মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের পরিবর্ত্তে, অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব যে সম্বোধন-বাণী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী ও সময়োপযোগী হইয়াছিল।"

সভাপতির অভিভাষণ

"অতপরঃ সভাপতিকে পুষ্পমাল্যদানে বরণ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, সভাপতি কবি কায়কোবাদ সাহেব তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। নিম্নে উক্ত অভিভাষণের সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"আমি জানি, আমি অযোগ্য—যোগ্যজনের প্রতি এই গুরু কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইলেই সুশোভন হইত। তথাপি আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য সাধনার কথা স্মরণ করিয়া যাঁহারা আমাকে এই মহাগৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই সুধীজন পরিবৃত সম্মেলনের অযোগ্য সভাপতিরূপে আমি যদি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা বলি, তাহা বোধ হয় বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন হইবে না। বাঙ্গলার মুসলমানের ধর্ম্মভাষা আরবী, ফার্সী, এবং উর্দ্দু ও প্রায় সেই পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে উর্দ্দু ভাষা শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে গৌণ প্রয়োজন। মুখ্য প্রয়োজন হইল, মাতৃ-ভাষার ভিতর দিয়া নিজেদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তোলা।

বঙ্গভাষা যে বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা এ সম্বন্ধে বোধ হয় এখন আর দ্বিমত নাই। অন্ততঃ অধিকাংশ বঙ্গীয় মুসলমানই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন। অল্প সংখ্যক যাঁহারা করেন না, তাঁহারা এখনও উর্দ্দুর স্বপ্নেই বিভোর হইয়া আছেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর তাঁহারা মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়া উঠেন, এবারও সেইরূপ কিছু আয়োজন

দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে ভয় বা আশঙ্কার কোন কারণ নাই। প্রকৃতির নিয়মকে উল্‌টাইয়া দিয়া উর্দ্দু কোনরূপেই বাঙ্গলার মুসলিম জনসাধারণের ভাষা হইতে পারে না। উহা কয়েক জন ভাব-বিলাসীর ভাষা হইতে পারে, ইহার বেশী কিছু নয়।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙ্গলা কেবল আমাদের মাতৃভাষা, জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা নহে। ইহার উপর হিন্দু মুসলমানের তুল্য অধিকার। আজ হয়'ত কাহারও নিকট মুসলমানের সাহিত্য সাধনার, বাংলা সাহিত্য সাধনার কোনমূল্য নাই,—কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইহার দেহে মুসলমানের দেওয়া অলঙ্কার দেখিয়া কেহ আর শিহরিয়া উঠিবে না; হয়ত সেদিন মুসলমানের পরিচর্য্যার ফলে বাঙ্গলা ভাষা নবজীবন লাভ করিবে, উহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শের ছাপ, আমাদের ভাবের ছাপ, আমাদের সাধনার ছাপ দীপ্যমান হইয়া উঠিবে। আমি সেই আশার স্বপ্ন দেখি।

আমার মাতৃভাষার পরিবর্ত্তন প্রয়াসী মুষ্টিমেয়কে আমি বলিতে চাই, আমার মায়ের যে ভাষা, যে ভাষায় আমি প্রথম কথা বলিতে শিখিয়াছি, যে ভাষা আমি সকল প্রাণমন দিয়া শিক্ষা করিয়াছি, যে ভাষায় আমি গল্প করিয়াছি, স্বপ্ন দেখিয়াছি—বন্ধু বান্ধবের সহিত মন খুলিয়া নানা বিষয় আলাপ ও আলোচনা করিয়াছি—গীত গাহিয়াছি, কবিতা লিখিয়াছি, সেই অমৃতোপম ভাষা আমার মাতৃভাষা না হইয়া, বাঙ্গলার বাহিরের একটি ভাষা যে কেমন করিয়া আমার মাতৃভাষা হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

একথা অবিসংবাদিত সত্য যে, মাতৃভাষার অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জাতীয় জীবন সম্যকরূপে গঠিত ও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। যাহারা বাঙ্গালী মুসলমানের জন্য এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গালী হিন্দুর জন্য আর এক প্রকারের বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন দেখিতে চান, আমি তাঁহাদের কেহ নহি। আমি বাঙ্গলার হিন্দু এবং বাঙ্গলার মুসলমানের জন্য এক মিলিত ভাষা চাই। মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কোনই প্রয়োজন অনুভব করি না।

আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সাহিত্যের দিক্ দিয়া সকল প্রকার সাধনা করিতে হইবে।

আমার নিবেদন এই যে, আমরা যেন বাঙ্গলা ভাষাকে অস্বাভাবিক না করিয়া তুলি। বাঙ্গলা সাহিত্যের বুকে ইসলামের ছাপ ফুটাইয়া তুলিতে হইলে ভাবের দিক দিয়াই উহার বিকাশ করিতে হইবে, প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দের প্রচলন দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে না। আমরা যাহা রচনা করিব তাহা যেন আমাদের প্রতিবেশীরাও অনায়াসে বুঝিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নতুবা আমাদের রচিত ভাষা বা সাহিত্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাষা বা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বাঙ্গালা দেশ আমাদের মাতৃভূমি। এই মাতৃভূমির ভাষা হইবে এক ও অখণ্ডিত। ইহাকে যাহারা খণ্ডিত করিতে চান, আমি তাঁহাদের রুচির এবং দেশ-প্রেমের প্রশংসা করিতে পারি না। আমার ভরসা আছে, মাতৃ-ভাষাকে দ্বিধাবিভক্ত না করিয়াও আমরা আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারিব। উহা বজায় রাখাই আমাদের কাজ,—ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করা নয়।

মুসলমানগণ আজ দুর্দ্দিনের যাত্রী, আমি নিজেও সেই যাত্রীদলের একজন। আমি জানি, আমাদের সম্মুখে কত বাধা ও কত অন্তরায়। বাধা ও অন্তরায়কে পদদলিত করাই পুরুষের কাজ। যুগে যুগে অগণিত মানবমণ্ডলী কত বাধা ও অন্তরায়কে অতিক্রম করিয়া নিজেদের গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে—কাম্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যকে সজীব ও উন্নত করিবার পথে যে সকল বাধা আছে, আমরা নিশ্চয় তাহা অতিক্রম করিয়া বাঞ্ছিত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি দ্বিধাহীন। হয়ত আপনাদের সম্বন্ধেও আমি বলিতে পারি যে আপনারাও দ্বিধাহীন।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। এখন আমি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদর্শী পরম করুণাময় খোদাতালার নিকট আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আপনাদিগকে আমার বিনীত সালাম জানাইতেছি।"

সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হইবার পর, সভায় কতিপয় শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।"

দর্শন ও ইতিহাস শাখার অধিবেশন

"অপরাহ্ণে ২॥ ঘটিকার সময় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধ্যাপক কাজেম উদ্দীন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে দর্শন শাখার অধিবেশন ও সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় অধ্যাপক জহরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ইতিহাস শাখার অধিবেশন হয়।"

সাহিত্য ও বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন

"২৬শে ডিসেম্বর সোমবার অপরাহ্ণ ১২॥ টায় ডাক্তার কুদ্‌রত-ই-খোদা ডি-এস-সি সাহেবের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখার অধিবেশন হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৩ টার সময় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম-এ সাহেবের সভাপতিত্বে সাহিত্য-শাখার অধিবেশন হয়, এবং রাত্রি ৭টার সময় মূল সম্মেলনের পুনরাধিবেশন হয়। সমাগত ভদ্রলোকবৃন্দের বক্তৃতা ও সভাপতির মন্তব্য সমাপ্ত হইলে পর, কবি কাজি নজরুল ইসলাম "বিদায়-সঙ্গীত" গান করেন এবং সম্মিলন ভঙ্গ হয়।"

৯ : ৬ ॥ মাঘ ১৩৩৯

শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা

"অনেকদিন আগের কথা, যখন বাংলাদেশে স্বদেশ সম্বন্ধে প্রথম মনের উদ্বোধন হলো তখন আমার বয়েস অল্প। তখনকার দিনের সাহিত্যে দেশাত্মবোধের প্রকাশ ছিল, মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য কামনার আভাস সেদিন ফুটে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে এইভাবে ভদ্রসমাজের মধ্যে এই রাষ্ট্রবোধ জাগরিত হতে লাগল। তারপর যখন আমার বয়েস অধিক হোলো, তখন দেখলেম কংগ্রেসের সূচনা হয়েছে ; — জনকয়েক ইংরেজ ও আমাদের দেশীয়দের মধ্যে সুরেনবাবু, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি যোগ দিয়ে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রবোধ জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেন। সেদিনের এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে দুটি ভাববার কথা আছে। প্রথম এই অনুষ্ঠানের আরম্ভে সমগ্র ভারতের রূপ ছিলো না ; তা' না থাকবার প্রধান কারণ যাঁরা এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁরা নগরবাসী—পল্লীর সঙ্গে তাঁদের সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ছিল, সামাজিক ও প্রাণের দুইই। তখনকার দিনে নগরে যাঁরা প্রাধান্যলাভ করেছিলেন

তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। মুসলমানের সংখ্যা ছিল স্বল্প; নগরের আকর্ষণ তাদের ছিল না, তারা ছিল গ্রামে।

কংগ্রেসের আরম্ভে জনসমাজের সাড়া পাওয়া যায়নি; তারা ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শিক্ষিত সমাজের মত নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি তাদের ছিল না; কারণ তারা অবোধ, তারা অজ্ঞান, তাদের শিক্ষা নেই। তখনকার দিনে ভদ্রসমাজকে নিয়েই দেশ, জনসাধারণ ছিল অবজ্ঞার পাত্র। যে কোনো উন্নতির চেষ্টা তখন হয়েছিল তা এই অবনত জনসাধারণকে বাদ দিয়ে।

সেদিন রাজভাষা ছিল আমাদের শিক্ষিত সামজের মাতৃভাষা,—রাষ্ট্র-সভায় সেই ভাষারই প্রচলন ছিল। মায়ের মুখের যে ভাষা সেই বাংলা ভাষার দিকে তারা ফিরেও তাকাননি এবং সেই সঙ্গে দেশের গ্রামবাসী-দেরও অবজ্ঞা করা হোলো। যদিও সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরেজী ভাষা ছাড়া সম্মিলিতভাবে দেখবার কোনও উপায়ই ছিল না, তবুও বাংলা ভাষাকে আমরা সব দিক দিয়ে উপেক্ষা করে এসেছি; তারি সঙ্গে বাংলার পল্লীমায়ের ছেলেমেয়েদের সুখ দুঃখের কথা বুঝতে চেষ্টা করিনি, তারা মনের ভিতর থেকে সুদূরে পড়েছিল।

আমার সেই অল্প বয়সের দিনে পরম সৌভাগ্য ঘটেছিল—এই গ্রাম-বাসীদের কাছে আসবার। তখন আমাদের জমিদারীর ভার ছিল আমার উপর, সেই সূত্রে গ্রামের লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সে আমার জীবনে আজ পর্য্যন্ত একটী অমূল্য সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত। তখন সেই নিরক্ষর নিরন্ন গ্রামবাসী-দের অব্যক্ত দুঃখ ক্রন্দন আমার হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল; আমি তাদের আমার সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবেসেছিলেম, তারাও তাদের সমস্ত অন্তরের সঙ্গে আমায় ভালবেসেছিল। তখন আমার চোখে পড়ল যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ক্ষীণ, দুর্ব্বল। তাদের অন্তরে দুঃখের জোয়ার ভাটা খেলচে। এতদিনের পীড়ন, অবজ্ঞা ও অপ-মানের চোখের জল আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। আমাদের সাহিত্যে তাদের দুঃখের কথা প্রকাশিত হয়নি। তাদের হৃদয়ের কাছে এসে দেখলেম তাদের তৃষ্ণার জল নেই, ক্ষুধার অন্ন নিঃশেষ, পীড়িত হ'লে রক্ষার জন্য দৃষ্টি নেই। রাষ্ট্রনেতারা ছিলেন এদের প্রতি উদাসীন।

যারা সমাজপতি, যারা শিক্ষিত তারা সবাই নিশ্চেষ্ট হয়ে শুধু নিজের স্বার্থ নিয়ে বসেছিলেন। তার কারণ এরা নিজেদের প্রকাশ করতে পারেনি ; এরা চীৎকার করে বলতে পারেনি এদের দুঃখ দৈন্য নির্য্যাতন, এদের লাঞ্ছনার কথা।

দুঃখের শুরু হোলো তখনই যখন ভদ্রসমাজ বিলাসের লালসায় শহরের আকর্ষণে দলে দলে গ্রাম ছেড়ে চলে এল। সেদিনের সেই সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। যারা পড়ে রইল তারা উপেক্ষিত অবজ্ঞাত। যেমন নদীর স্রোত মরে গেলে তলায় পাঁক ও পাথর কঠিন, পীড়াজনক হয় এ তেমনি। দেশের আন্তরিক দুর্গতির শুরু হলো সেদিন থেকে, এবং শিক্ষিত সমাজই তার জন্য দায়ী। তখন দেশের নেতারা মেতেছিলেন নিজেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থার জন্য। উপরের শ্রেণীর সুখসুবিধা আলোচনা করাই ছিল তখনকার Political agitation-এর মূলকথা। আমরা তখন গাছের ফুল ও ফলের প্রস্ফুরণ ও পরিসৃষ্টির কথা ভেবেছি—কিন্তু যে মাটী থেকে রস আহরণ করে গাছ ফুল ফোটাবে, ফল পাকাবে সেই মাটিতে খাদ্য যোগাতে আমরা পারিনি। পল্লীসমাজের কাছ থেকে আমরা শুধু শুষে নিয়েছি তাকে ফিরিয়ে দেইনি কিছুই। তাই তারা অজ্ঞান। যেখানে দৈন্য, অবজ্ঞা সেখানে বাঁচবার আশা করা মিথ্যে—সেখানে আমরা মর্‌তে বাধ্য।

আমার এই অনুষ্ঠানের (শান্তিনিকেতন) মধ্যে দিয়ে আমি চেয়েছিলেম গ্রামবাসীদের শিক্ষাদানের দ্বারা বুঝিয়ে দিতে—কোথায় তাদের কি প্রয়োজন, কি দাবী। যেদিন ওরা বুঝতে পারবে নিজেদের দায়িত্ব সেই দিনই শুরু হবে দেশের প্রকৃত কাজ। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণের মিলনগ্রন্থীকে দৃঢ় করা, সত্য করে তোলা। আজ যারা বাইরে থেকে এই অনুষ্ঠানের উৎসবে যোগে দিয়েছেন তাঁরা দেখুন বড় দুঃখের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে এই অনুষ্ঠান জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশের জনকয়েক সাহিত্যিক লিখে জানিয়েছিলেন যে, আমি দেশের এই দুর্দ্দিনে ভাববিলাসে মগ্ন, কেবল কবিত্বই করি। অনেকেই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিত্ব নিয়েই মেতে আছেন। একথা শুধু বাঙ্গলাদেশ আমায় বলেছে, সমুদ্রপারের লোকেরা নয়। আমার

দেশবাসীরা মনে করেন—কর্ম্ম করেন তারাই, যাঁরা ভোটযুদ্ধ ও ভোট-গণনায় ব্যস্ত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ রয়েছে আমার এই কর্ম্মক্ষেত্রে (শান্তিনিকেতন)। দুঃখের সঙ্গে জানাতে হোলো যে আমি শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে কিছুই পেলাম না, কিন্তু আমার সান্ত্বনা শুধু এই এবং এই বিশ্বাস নিয়েই আজ আমি আমার কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি যে, গ্রামবাসীরা আমাকে পরমাত্মীয় করে নিয়েছে। তাদের অন্তরের ভালবাসা ও উপকার আমি পেয়ে এসেছি। আজ আমি নির্ভয়ে বিনা দ্বিধায় বলতে পারব যে, এই অনুষ্ঠানের বিনাশ নেই, এ প্রতিদিন শাখা প্রশাখায় ফুলে পল্লবে বিস্তার লাভ করবে। আমার এই সৃষ্টিকার্য্যের প্রধান সম্পদ আমার চারিপাশের গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা। আমার বিশ্বাস যে, আমি আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে দেখে যেতে পারব যে আমার কাজ আপনাতে আপনিই বিকশিত হয়ে উঠেছে। ৩৩ কোটির জন্য ভাবতে পারিনি, ভাববার মত শক্তি সামর্থ্য ছিল না। এই প্রান্তরের প্রান্তরে সঙ্কীর্ণ সীমায় যে আলো জ্বলছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে একদিন না একদিন সমগ্র দেশকে আলো দান করবে।

যে প্রদীপ এখানে জ্বলেছে তাকে উৎসর্গ করলেম দেশের জন্য। আমি শুধু চাই আমার অন্তরের বন্ধু গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, যাদের মুখে বাণী নেই, যাদের ভিতরে আলো জ্বলেনি। তারা নিঃসঙ্কোচে নির্ব্বিঘ্নে তাদের যা কিছু আহূতি দেবার জন্য নিয়ে আসুক এই যজ্ঞক্ষেত্রে এবং তাই নির্ব্বাণহীন নির্ম্মল আলো হয়ে চিরকাল জ্বলবে।"

১৯ : ৩ ॥ আষাঢ় ১৩৪৩

পরলোকে মাক্‌সীম্‌ গর্কী

"রাশিয়ার জগদ্বিখ্যাত সর্ব্বহারা-ঔপন্যাসিক মাক্‌সীম্‌ গর্কী আর ইহজগতে নাই। কিছুদিন আগে রাশিয়ার প্রধান নগরী মস্কোতে ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুলোকে যাত্রা করিয়াছেন।"

গর্কীর প্রকৃত নাম ছিল পেশকফ। কিন্তু, যৌবনকালে সেই নাম ত্যাগ করিয়া তিনি গর্কী নাম গ্রহণ করেন। গর্কী অর্থ তিক্ত। তিনি ছিলেন দরিদ্র শ্রমিকের সন্তান। অতি অল্প বয়সে তাঁহার বাপ-মা

মারা যান। দশ বৎসর বয়সের সময় নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের জন্য তাঁহাকে জীবন-সংগ্রামে নামিতে হয়। প্রথমে তিনি জুতা সেলাই-য়ের কাজ করেন। তারপর ষ্টীমারের বাবুর্চি, রুটি প্রস্তুতকারক হইতে আরম্ভ করিয়া কেরাণীর কাজ পর্য্যন্ত অনেক কিছুই তিনি করেন। এই নিরলস শ্রমিক-জীবনের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি ভবিষ্যের এক অপূর্ব্বতর সাহিত্যের সূচনা করিলেন। রাশিয়ার সাহিত্যাকাশে গর্কীর উদয় নব প্রভাতের নবীন সূর্য্যের মতো।

জার শাসনের কঠিন নিষ্পেষণে রাশিয়ার জনগণ তখন পর্যুদস্ত। দারিদ্র্য, হতাশা ও বন্ধনের চাপে জীবন তখন অতিষ্ঠ। দেশের সেই দুর্দ্দিনে মুক্তির বৃহত্তর লক্ষ্য লইয়া যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে গর্কীর স্থান সর্ব্ব উচ্চে। টলষ্টয়ের সাহিত্য ছিল ধর্ম্ম-প্রবণ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। দস্তয়ভস্কীর সাহিত্যে কেবল হতাশ দুঃখের গান। কিন্তু, গর্কী আসিলেন সেখানে বিদ্রোহের রক্ত ঝাণ্ডা উড়াইয়া। নগ্ন বাস্তবতার মধ্যে গভীর এক সৌন্দর্য্যবোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁহার সাহিত্যে।

রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি একবার যুদ্ধক্ষেত্রে যান এবং সেখান হইতে আহত হইয়া ফিরিয়া আসেন। তৎপর রাশিয়ায় সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হওয়ার পর বলশেভিকগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। দরিদ্র সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক-দের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে বলশেভিকগণ তাঁহাকে যথেষ্ট অধিকার প্রদান করেন। তাঁহার সাহিত্যের প্রধান সুর ছিল বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পৃথিবী ব্যাপী এক সাম্যতন্ত্র সমাজের গঠন করা। তাঁহার ‘মাদার’ নামক বিখ্যাত বইখানি বাঙলা ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁহার চল্লিশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে তিনি আরো অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ‘ফোমা গরডিফ্’, ‘ডিকাডেন্স’ প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃদ্ধ বয়সে রোগে-দুঃখে শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে,—তখনও তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। প্রত্যহ ৯টা হইতে ১টা ও অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লিখিতে হইত।”

২০ : ৩ ।। মাঘ ১৩৪৪

পরলোকে শরৎচন্দ্র

"বাংলার অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক স্বনামধন্য শরৎচন্দ্র গত ২রা মাঘ রবিবার সকাল দশ ঘটিকায় সমগ্র বঙ্গদেশকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে-স্থান শূন্য হইয়া গেল তাহা আর পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মৃত্যুকালে শরৎচন্দ্রের বয়স ৬২ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সাধারণ বাঙালী'র আয়ুর হিসাব ধরিলে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুকে অকাল-মৃত্যু হয়তো বলা যায় না, কিন্তু তাঁহার এই তিরোধান এতই আকস্মিক এবং অভাবিত যে, তাহার বেদনা বাংলার অন্তরকে অতি গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে, বাঙালী সে বেদনা শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

শরৎচন্দ্র কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই উদরে যন্ত্রণা অনুভব করিতে-ছিলেন। আহার্য্য দ্রব্য কিছুই পরিপাক হইতেছিল না। সাধারণ অসুখ মনে করিয়া শরৎচন্দ্র উহা কতকটা উপেক্ষা করিয়াই আসিতেছিলেন। পরে যখন রোগের যন্ত্রণা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল তখন বাধ্য হইয়াই তিনি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসকগণ চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন বটে—কিন্তু কোনো ভরসা দিতে পারিলেন না। পরীক্ষায় পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়াছে প্রকাশ পাইল। চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার সুবিধার জন্য রোগীকে তাঁহার বাসভবন হইতে নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হইল। শহরের বিখ্যাত ডাক্তারগণ রাত্রিদিন, অক্লান্ত ভাবে খাটিয়া বাংলার শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীকে বাঁচাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেন। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে কয়েক সপ্তাহ কাটিল। অবশেষে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া শরৎচন্দ্র মহাপ্রস্থান করিলেন।

কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ ভস্মীভূত হয়। কলি-কাতার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের শবানুগমনে যোগদান করিয়া পরলোক-গত সাহিত্যিকের প্রতি তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কোনো

সাহিত্যিকের মৃত্যুতে এরূপ বিরাট শোভাযাত্রা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহা হইতে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার একটা পরিমাপ পাওয়া যায়।

বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র (ইং ১৮৭৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর) হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর এবং যৌবনেরও কিয়দংশ ভাগলপুরে তাঁহার মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। প্রথমে তিনি তাঁহার নিজগ্রাম দেবানন্দপুরের পাঠশালায় শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে ভাগলপুরে গিয়া সেখানকার তেজনারায়ণ জুবিলি স্কুলে ভর্ত্তি হন্ এবং সেই স্কুল হইতেই এন্ট্রান্স পাশ করেন। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সমালোচক, 'নায়ক' ও 'সাহিত্য' সম্পাদক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্কুলে শরৎচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হয় এই ভাগলপুরেই। এখানে তিনি তাঁহার মাতুলগণ এবং কয়েকজন বন্ধুসহ একটি সাহিত্য সমিতি গড়িয়া তোলেন। সেই সাহিত্য সভায় নিয়মিত ভাবে তাঁহাদের রচনা পঠিত হইত। এই সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র ও তাঁহার মাতুলগণ ব্যতীত সুলেখিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও যোগদান করিতেন। শরৎচন্দ্রের মাতুলগণও প্রত্যেকেই পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে নাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। তন্মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গগত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নামও বাংলার পাঠকদের নিকট সুপরিচিত।

শরৎচন্দ্র আবাল্যই আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত ছিলেন। সেইজন্য বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার রচনা কোথাও মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গল্প 'কুন্তলীন' পুরস্কার-প্রাপ্ত 'মন্দির'। ইহাও তিনি প্রথমে অন্যের নামে প্রকাশ করেন।

এফ. এ. পড়িবার সময়েই শরৎচন্দ্রকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে হয়। ১৯০৩ সালে তিনি ভাগলপুর হইতে কলিকাতা চলিয়া আসেন এবং ছোট-খাট দুই একটা চাকুরীতে যোগ দেন। কিন্তু সে চাকুরী তিনি

অধিকদিন করিতে পারেন নাই। অতঃপর ১৯০৫ সালে তিনি ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুন গমন করেন।

এই সময়ে ভারতীতে শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস বড়দিদি প্রকাশিত হয়। বড়দিদি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাংলা সাহিত্যে অকস্মাৎ এক প্রতিভাবান সাহিত্যিকের আবির্ভাবে বাঙালী চমৎকৃত হইয়া যায়। সাহিত্য জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এরূপ সৌভাগ্য খুব কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটিতে দেখা যায়। অপর পাঁচজনের মত তাঁহাকে ঘসিয়া মাজিয়া বড় হইতে হয় নাই। মধ্যাহ্ন আকাশে প্রদীপ্ত ভাস্করের মত তিনি অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই আকস্মিক খ্যাতি লাভের পিছনে যে বহুদিনের নীরব ও নিবিড় সাধনা নিহিত ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ক্রমে বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি গল্প 'যমুনা' কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় শরৎচন্দ্রের খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি যখন এইভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের অনুরোধে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষে লিখিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তাঁহার সমুদয় রচনার অধিকাংশ ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হয় এবং প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে শরৎচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত বিচিত্রা মাসিক পত্রিকাতেও প্রকাশিত হইয়াছে। জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং পুস্তক প্রকাশ দ্বারা যথেষ্ট আয় হইতে থাকায় শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান হইতে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন: কাশীনাথ, বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, চন্দ্রনাথ, পরিণীতা, বৈকুণ্ঠের উইল, মেজদিদি, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত (১ম-৪র্থ), দেবদাস, বিপ্রদাস, নিষ্কৃতি, স্বামী, দত্তা, দেনাপাওনা, নব-বিধান, শেষপ্রশ্ন, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, অনুরাধা, সতী ও পরেশ, হরিলক্ষ্মী এবং নারীর মূল্য।

শরৎচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একমাত্র 'নারীর মূল্য' নামক পুস্তকখানিই প্রবন্ধের বই। বাকী সবগুলিই কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে অধিকাংশই উপন্যাস, গল্প-গ্রন্থও কয়েকখানি আছে। 'নারীর মূল্য' গ্রন্থখানিও শরৎচন্দ্র নিজ নামে প্রকাশ না করিয়া 'অনিলা দেবী' এই ছদ্মনামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনিলা দেবী শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রামে ইঁহার বিবাহ হয়। শরৎচন্দ্র তাঁহার এই ভগ্নির এবং ভগিনীপতির বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। শরৎচন্দ্রের একক জীবনে দিদির ভালোবাসা অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু ছিল।

রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া শরৎচন্দ্র প্রথমে কিছুকাল শিবপুরে বাস করেন। পরে দিদির স্নেহের আকর্ষণে পানিত্রাসে গমন করেন এবং পানিত্রাসের পার্শ্ববর্ত্তী সামতাবেড়ে নামক গ্রামে রূপনারায়ণ নদীর তীরে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল তথায় বাস করেন। শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি বিখ্যাত গ্রন্থ এই পানিত্রাসেই রচিত হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার প্রথম জীবন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই অতিবাহিত হয়। পরবর্ত্তী জীবনে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র অবশ্য ধনী হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা বালিগঞ্জে একখানি সুরম্য আবাসভবনও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থের অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হইয়াছে এবং পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারাই তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। এক কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা দেশের আর কোনো লেখকেরই এরূপ সৌভাগ্য ঘটে নাই।

শরৎচন্দ্রের রচনার সহজ সাবলীল ভঙ্গী, উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রগুলির কথোপকথনের সরল মনোরম স্বাভাবিকতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্ব শরৎচন্দ্রের রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। সমাজে যাহারা অবহেলিত ও অবমানিত, পতিতা বলিয়া যাহাদের আমরা চিরদিন উপেক্ষা করিয়াছি—শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনার পাত্রপাত্রী সেই অবহেলিত সমাজ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, মর্ম্মে মর্ম্মে তাহাদের দুঃখ অনুভব করিয়াছেন এবং আপনার অনুপম তুলিকার সাহায্যে তাহাদের চিত্র অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনার

ভিতর দিয়া অন্তরের যে দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে—অপর কাহারও রচনায় তাহা দুর্ল্লভ। এই আন্তরিকতা, এই সত্যদৃষ্টি এবং ভাষার এই মনোরম স্বচ্ছতাই শরৎচন্দ্রের রচনাকে এতটা জনপ্রিয় করিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের দেশপ্রেম অতি গভীর ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কিছুকাল শরৎচন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রেও যোগদান করিয়াছিলেন। দেশবাসীর প্রতি তাঁহার ভালোবাসার অন্ত ছিলনা। বহু দরিদ্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তিনি এজন্য গোপনে এত অর্থ দান করিতেন যে মৃত্যুকালে কলিকাতাস্থিত তাঁহার নিজের বাসভবনটি ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

শরৎচন্দ্র আজীবন অকৃতদার ছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে শরৎচন্দ্রই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগ করেন এবং রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। সন্ন্যাসী অবস্থায় স্বামী বেদানন্দ রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। মিশনের কাজে নানা স্থানে ঘুরিয়া ১৯৩০ সালে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া তিনি যখন দেশে ফিরেন তখন মঠে না উঠিয়া শরৎচন্দ্রের পানিত্রাসের বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন। সেখানে শরৎচন্দ্রের কোলেই তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে শরৎ-চন্দ্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রই মাত্র জীবিত রহিলেন। প্রকাশচন্দ্র হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেন এবং এতাবৎ কাল সপরিবারে শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই তাঁহার বালিগঞ্জস্থিত বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় উইল করিয়া বাসভবনখানি শরৎচন্দ্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা ও ঢাকা বাংলার এই উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণকে জগত্তারিণী পদক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রথম বৎসর এই পুরস্কার রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরেই উহা শরৎচন্দ্রকে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ডক্টর অফ্ লিটারেচার' উপাধি দিয়া শরৎচন্দ্রকে সম্মানিত করেন।

শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস নাটকাকারে কলিকাতার রঙ্গ মঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিরাজ বৌ, পল্লীসমাজ, ষোড়শী, চরিত্রহীন ও গৃহদাহের নাম উল্লেখযোগ্য। সিনেমাতে শরৎচন্দ্রের যে উপন্যাসগুলির

চিত্ররূপ হইয়াছে তন্মধ্যে দেনাপাওনা, পল্লীসমাজ, দেবদাস, গৃহদাহ, বিজয়া ও পণ্ডিতমশাই এর নাম করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত শরৎচন্দ্র আরও একখানি বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী' রচনা করিয়াছিলেন। অধুনা-লুপ্ত 'বঙ্গবাণী' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। উপন্যাসখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উহা রাজরোষে পতিত হইয়া বাজেয়াপ্ত হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে অতঃপর তিনি মুসলমান সমাজ লইয়া উপন্যাস রচনা করিবেন। দুঃখের বিষয় সেই বাসনা অপূর্ণ রাখিয়াই শরৎচন্দ্র লোকান্তরিত হইলেন। শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠকগণ শরৎচন্দ্রের এই নূতন রচনা দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিল।

শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস, হিন্দী, ইংরেজী, ফরাসী এবং অন্যান্য ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই তাহা প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। শরৎচন্দ্রকে হারাইয়া বাংলা দেশ যে বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছে—বাংলার এবং ভারতের বাহিরেও শরৎচন্দ্রের ভক্ত পাঠকগণ সেই বেদনাই অনুভব করিতেছেন। আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে শরৎচন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যকে নবতর সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। পরলোকে তাঁহার আত্মা অনন্ত শান্তি লাভ করুক ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।"

২১ : ৬ ।। বৈশাখ ১৩৪৬

পরলোকে প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন

"বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক রায় বাহাদুর জলধর সেন গত ৯ই এপ্রিল তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য-সাধনার পর ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিয়াছে। আমরা পরলোকগত সাহিত্যিকের আত্মার জন্য খোদাতা'লার করুণা প্রার্থনা করিতেছি—এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

জলধর বাবুর মত নিরভিমান ও অনাড়ম্বর লোক খুব কমই চোখে পড়ে। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালী চরিত্রে যে সরলতা, আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিল জলধর বাবুর চরিত্রে তাহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

জলধর বাবু ছিলেন স্বভাব-সাহিত্যিক। অল্প বয়স হইতেই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ দৃষ্ট হয়। "গ্রামবার্ত্তা", ও "সোম প্রকাশ" পত্রিকায় তাঁহার প্রথম যুগের প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক রূপে ও তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", "হিতবাদী" ও "সুলভ সমাচার" পত্রিকায় তিনি সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদকরূপে বহু বৎসর কাজ করিয়াছেন। বাংলা ১৩২০ সালে তিনি "ভারতবর্ষের" সম্পাদক নিযুক্ত হন।

জলধর বাবু ভ্রমণবৃত্তান্ত, ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম স্থানসমূহের ভ্রমণ-কাহিনী সম্বলিত তৎপ্রণীত "হিমালয়" নামক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। ছোটগল্প ও উপন্যাস সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে "দুঃখিনী", "বিশুদাদা", "অভাগী" প্রভৃতি সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সনে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। এই প্রবীণ সাহিত্যিকের পরলোক গমনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পরিপূরিত হওয়ার নহে।"

২১ : ৭ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন

"বিগত ৬ই মে শনিবার বাঙলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক কলিকাতার মুস্‌লিম ইন্‌স্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে উঠিয়া মিঃ হক বলেন : "এরূপ সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যাঁহারা সাহিত্যিক, যাঁহারা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিলে তিলে জীবন বিলাইয়া দিতেছেন,

সঙ্কীর্ণতাকে যাঁহারা হৃদয়ে স্থান দেন না, তাঁহাদের এরূপ সম্মেলনের কথা নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই। সাম্প্রদায়িকতার দূষিত বাষ্পে আজ বাঙলার বাতাস কলুষিত, এই দূষিত হাওয়াকে কোন রকমে বিদূরিত করিতে আমরা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। সাহিত্যিকদের চেষ্টায় হয়ত এই আবহাওয়া দূরীভূত হইতে পারে। সাহিত্যের ক্ষমতা অসীম। সাহিত্যিকদের উপর খোদার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়, কাজেই তাঁহারাই দেশের সত্যকার মঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন।"

মুসলমান সাহিত্য সম্মিলন

"ইতিমধ্যে কলিকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হইল। বর্ত্তমানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দৃষ্ট হওয়ায় এবং সে জাগরণ বহু স্থানেই বাস্তব কার্য্যে রূপ গ্রহণ করায় সকলেই আশা করিয়াছিল যে, এবারকার মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীও খুব সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। মাননীয় মৌঃ ফজলুল হক সাহেবকে রাষ্ট্র-নেতা পাইয়া বাংলার মুসলমান রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে যেমন মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে, কবি নজরুল ইসলামকে পাইয়া সাহিত্যক্ষেত্রেও তারা তেমনি মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান আজ আর উপেক্ষার জিনিষ নয়।

সুতরাং এবারকার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনী, মুসলিম-বঙ্গের শুধু নয়, বরঞ্চ গোটা তরুণ বাংলার আদর্শ সাহিত্য সম্মিলনী হইবে, অন্ততঃ আমরা মনে মনে এরূপ আশা পোষণ করিতেছিলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উদ্যোক্তাদের খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারিতার ফলে সম্মিলনী মোটেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বাংলার গৌরব, নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা মৌঃ এ. কে. ফজলুল হক সাহেব অনেক সরকারী কার্য্য ফেলিয়াও এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। খান বাহাদুর মৌঃ আজিজুল হক সাহেবও এই সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির দু'এক জন সদস্যও রাত-দিন ইহার জন্য খাটিয়াছেন। তবু কোনো কোনো ব্যবসাদার রাজনীতিজ্ঞের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে সম্মিলনীর

শাখা নিয়োগ ও সভাপতি নির্ব্বাচনে ত্রুটী হইয়াছে এবং এই ত্রুটীর ফলেই এত চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া সম্মিলনীকে আশানুরূপ সফল করা যায় নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় রাজনীতি ঢুকাইলে তার ফল এমনি হইতে বাধ্য। আশা করি ভবিষ্যতে সম্মিলনীর উদ্যোক্তারা এদিকে অবহিত হইবেন।

অভ্যর্থনা সমিতির প্রকৃত কর্ত্তাদের খাম-খেয়ালী, ঘনঘন সভাপতি পরিবর্ত্তন, সম্মিলনীর তারিখ পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে এবং অন্যান্য ত্রুটীতে সম্মিলনীর অভিভাষণ ও পঠিত প্রবন্ধসমূহ কিছুই ভাল হয় নাই। সাহিত্য-শাখার সভাপতি মিঃ এস. ওয়াজেদ আলীর অভিভাষণ ব্যতীত আর কোনো অভিভাষণই উল্লেখযোগ্য হয় নাই। এই জন্যই সম্মিলনীতে লোক সমাগমও তেমন হয় নাই।

বিশেষতঃ তরুণ বাঙলা সাহিত্যের স্রষ্টা নজরুল ইসলামকে সম্মিলনীতে যোগদান করাইবার ব্যবস্থা না করিয়া উদ্যোক্তারা বিদ্যালয়ের তরুণ মুসলিমের প্রাণে একেবারে ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

২৬ : ২ ॥ পৌষ ১৩৫০

চীনা লেখকদের আন্দোলন

"চীনের একটী সাম্প্রতিক বার্ত্তায় প্রকাশ, ভরণপোষণের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সে দেশের লেখক ও গ্রন্থকারগণ প্রকাশকদের নিকট হইতে আগের চেয়ে বেশী পারিশ্রমিক দাবী করিতেছেন। এজন্য তাঁরা একটী আন্দোলনও সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁরা বলিতেছেন, তাঁদের লিখিত প্রতি এক হাজার শব্দের জন্য এক তাউ (১৭.৬ পাউণ্ড) চাউল বা তন্মূল্য ১৩০ হইতে ১৪০ (চীনা ?) ডলার দিতে হইবে। চীনা প্রকাশ-করা দুর্গত লেখক ও গ্রন্থকারদের এই দাবী মানিয়া নিবেন কিনা, আমরা জানি না; তবে সাধারণতঃ ধনিক ও অতিলাভলোলুপ ব্যবসায়ী শ্রেণী যে দেহের বা মস্তিষ্কের পরিশ্রমের মূল্য ভয়াবহ দুর্গতির সাম্‌নেও সাধ্যপক্ষে বাড়াইতে চান না, এটা সবারই জানা কথা। যাহোক, এই সংবাদটী পাঠ করিয়া ক'টী বিষয় পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। প্রথমতঃ,

মোটামুটী ছয় বৎসরকাল জাপানের আক্রমণের বেগ ঠেকাইতে গিয়া চীনারা ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছেন এবং ভারত হইতে সাহায্যের পথ—বার্ম্মা রোড—জাপানের অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় তাঁদের এই বিপদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তা না হইলে ১৭.৫ পাউণ্ড চাউলের মূল্য ১৪০ ডলারে গিয়া ঠেকিত না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশ চীন দেশের চেয়ে দরিদ্রতর না হইলেও এবং যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ভারতের মাটীতে সংঘটিত হইতে না থাকিলেও ভারতে—বিশেষতঃ বাংলায় যদি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র লেখক সাহিত্যিক ও কবিদেরও জীবনান্ত দশা উপস্থিত হইয়া থাকে, তা হইলে চীনের মতো দরিদ্র, যুধ্যমান ও শত্রু বিধ্বস্ত দেশে তাঁদের দুর্দশার নিশ্চয়ই সীমা পরিসীমা নাই। তৃতীয়তঃ, চীনে একটা স্বাধীন গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত এবং সেই গবর্ণমেন্ট চীনাদের যুদ্ধোদ্যম অটুট রাখবার জন্য খাদ্যাদি সম্পর্কে যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিতে তৎপর। তা সত্ত্বেও লেখকদের মতো একটা অতিপ্রয়োজনীয় শ্রেণীর লোকদের কষ্ট তাঁরা দূর করিতে পারিতেছেন না। পারিলে লেখকরা কখনো মাতৃভূমির চরম বিপদ মুহূর্ত্তে প্রকাশ্যে ব্যবসায়ী ধনীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিতেন না। এ অবস্থায় এ দেশের লেখক, কবি ও সাহিত্যিকদের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্গতি আপনোদিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, মনে করা যায় না। কেননা আমরা পরাধীন ; ··· শোষণ প্রবৃত্তিকেএ কটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার ইচ্ছাই এখানে অনুভব যোগ্য নয়। খাদ্যের ... দুর্ম্মূল্যতা নিবারণের কোন চেষ্টা দুর্ভিক্ষজনিত ভয়াবহ মৃতুর হার কমাইবার পক্ষেও এযাবৎ যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমাদের দরিদ্র সাহিত্যসেবীদের সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকা ছাড়া গত্যন্তর দেখা যায় না।”

২৬ : ২

রোমাঁ রোলাঁর আদর্শ

“জার্ম্মাণ বন্দীশালায় বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী মনীষী ও সাহিত্যিক রোমাঁ রোলাঁর জীবনাবসানের শোকাবহ সংবাদ প্রচারিত হইবার কিছুদিন পরেই আবার এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশিত হয়। কাজেই ...বর্ত্তমানে একজন প্রথিতযশা মনীষীর জীবনমৃত্যু সম্পর্কে অনেকখানি সন্দেহ ও

অনিশ্চয়তার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। তথাপি এই অবসরে রোমাঁ রোলাঁর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথা মানুষের মনে ভিড় জমাইবে, এইটাই স্বাভাবিক। সঙ্গীতজ্ঞ ও সমালোচক হিসাবেই তিনি প্রথমে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এরপর তিনি নাটক রচনায় হাত দেন। কিন্তু উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁর সৃষ্টিধর্ম্মী মৌলিক প্রতিভার পরিচয় সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "জা ক্রিস্তোফা" লিখিয়া ১৯৩৫ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। জগতের সকল দেশের লোক এই সময় হইতেই রোমাঁ রোলাঁর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আগ্রহশীল হয়। তা হইলেও সাহিত্যে বিরাট প্রতিভাই তাঁর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশের লোকদের কাছে তিনি শান্তিবাদী বলিয়া সম্মানিত। বস্তুতান্ত্রিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিরুদ্ধতা এবং প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতাবাদের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁর প্রচারিত আদর্শের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গত বিশ্ব সমরের উপক্রমকালে শান্তিবাদের প্রতি একান্ত পক্ষপাতিত্বমূলক প্রচারণার জন্যই তাকে রাজরোষের সম্মুখীন হইতে হয়। এবারকার মহাযুদ্ধেও নাৎসী কয়েদখানার জীবন তাঁর ভাগ্য হইল। রোমাঁ রোলাঁর মতবাদ মোটামুটী এই যে, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষে মানুষে বিরোধ, অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহের মূলীভূত কারন। তাই জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আধ্যাত্মিকতাবাদই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ উপায়। ইয়োরোপ তাঁর এই মতবাদ মানিতে প্রস্তুত নয়; তাই আদর্শবাদী রোমাঁ রোলাঁর স্বীকৃতি প্রাচ্যেই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। এটা তাঁর সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, বলা কঠিন। তবে একথা সত্য যে, যদি রোমাঁ রোলাঁর মনীষা বস্তুতান্ত্রিক পথে জাগতিক শান্তির সন্ধানে তাঁকে চালাইয়া দিতে পারিত, তিনি প্রাচ্যের মৃত্যুবাহী আধ্যাত্মিকতার চেয়ে বাস্তবতর কোন উপায় অবশ্যই দেখিতে পাইতেন। তা হইলে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবখানেই তাঁর আদর্শের অর্থ সমান বোধগম্য হইত।"

২৬ : ৯॥ শ্রাবণ ১৩৫১

সাহিত্যিকদের সাহায্য

"শুনিতে পাওয়া যায়, সাহিত্যিক ও কবিরা সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক বলিয়া গণ্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা দেশে তাঁরা তাঁদের স্বেচ্ছাদত্ত

সেবার বিনিময়ে সমাজের নিকট হইতে কার্য্যতঃ যেরূপ অবহেলা, এমন কি অবজ্ঞা, পাইয়া থাকেন, আজকার ইতিহাসে তার তুলনা মেলে কি? গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে কবি ও সাহিত্যিক-সমাজ যেরূপ ভীষণ দুর্গতির আবর্তে পড়িয়াছিলেন এবং এখনও তাঁদের যেভাবে তার জের টানিতে হইতেছে, সেদিকে কারুর তেমন দৃষ্টি ছিল না বা এখনও নাই! ...এই নির্ম্মমতায় ব্যথিত হইয়া অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছেন যে, বাংলা গবর্ণমেন্ট দুর্গত কবি ও সাহিত্যিকদের মাসিক সাহায্য দানের জন্য এবারকার বরাদ্দকৃত ব্যয় হইতে ত্রিশ হাজার টাকা স্বতন্ত্র করিয়া রাখুন। অবশ্য বাংলার আইন-সভায় সরকার ও সরকার বিরোধী দলে যেরূপ নির্ব্বিচার রেষারেষি চলিতেছে, তাতে অধ্যাপক কবীরের এই প্রস্তাবের ভাগ্যে কি আছে, বলা কঠিন। তাঁর প্রস্তাবটীর উদ্দেশ্য যে প্রশংসনীয়, একথা বলিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা ভাবিতেছি, ব্যবস্থাপরিষদের কোন সভ্য এইরূপ একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অগ্রসর হন নাই কেন। ভোলার কবি মোজাম্মেল হক, ঢাকার সাহিত্যিক আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা কি সাহিত্যিকদের প্রতি মমতা একেবারেই বিসর্জন দিয়াছেন?"

২৬: ১০ ॥ ভাদ্র ১৩৫১

সাহিত্যিক বৃত্তিদান

"বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবকে বাংলা গভর্ণমেন্ট মাসিক ২০০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তিদান করিয়াছেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি এবং মন্ত্রিসভার এই কার্যের জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বাংলা কাব্যে ও সঙ্গীতে কাজী সাহেবর দান অসামান্য। তা সত্ত্বেও গত দু' বছরেরও অধিককাল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তিনি চরম আর্থিক দুর্গতি ভোগ করিতেছিলেন, এতে বাঙালী জাতির লজ্জা রাখিবার স্থান ছিল না। বাংলা গবর্ণমেন্ট আমাদের জাতির সেই লজ্জা মোচন করিয়াছেন, এ জন্য সবাই তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা আশা করি, বাংলার অন্যান্য শক্তিমান সাহিত্যসেবী, যাঁরা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া, বিশেষতঃ বাংলার দুর্ভিক্ষ অবস্থার হিড়িকে, একান্ত দুর্গতিপন্ন জীবন যাপন করিতে

বাধ্য হইতেছেন, তাঁদের প্রতিও বাংলা গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহ দৃষ্টি পতিত হইবে এবং তাঁদের ও অচিরে যথোপযুক্ত সাহিত্যিক বৃত্তি দিয়া বাংলা সাহিত্যের শক্তিমতি সাধনাকে অন্ততঃ কিছুটা নিরাপদ করা হইবে।"

২৭: ৩, মাঘ ১৩৫১

পরলোকে রোমাঁ রোলাঁ

"ইতিপূর্ব্বে একবার গুজব রটে যে, বিখ্যাত ফরাসী লেখক, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত, মনীষী রোমাঁ রোলাঁ জার্মাণ বন্দী-নিবাসে পরলোক-গমন করিয়াছেন। পরে এ সংবাদ মিথ্যা পতিপন্ন হয়। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি সত্যই ফ্রান্সে মারা গিয়াছেন। রোমাঁ রোলাঁ সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও কিছুকাল ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি কথা-সাহিত্যের দিকে মনোযোগ দেন। এবং 'জন ক্রিস্তোফা' নামক বইখানি লিখিয়া জগদ্ব্যাপী যশ অর্জন করেন। তিনি গোঁড়া রকমের শান্তিবাদী ছিলেন; এজন্য ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অন্যান্য অনেক মহাপুরুষ ছাড়াও তিনি মহাত্মা গান্ধীর একখানি জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। তা হইলেও তাঁর তিরোধানে এমন একজন মনীষীর স্হান জগতে শূন্য হইল, যার অভাব আজিকার সংগ্রামপীড়িত বিশ্ব মর্মে মর্মে অনুভব করিবে।"

কবি হালীর মৃত্যু বার্ষিকী

"সম্প্রতি বিখ্যাত উর্দ্দু কবি আলতাফ হোসেন হালীর ৩০শ মৃত্যু বার্ষিকী বঙ্গীয় আঞ্জুমান তরক্কিয়ে উর্দ্দুর উদ্যোগে কলিকাতাস্থ ইসলামিয়া কলেজ হলে মিসেস্ সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মিসেস নাইডু নিজে চমৎকার উর্দ্দু কবিতা লিখিতে পারেন, কাজেই 'মসদ্দসে হালী'র লোকান্তরিত কবিকে তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন, এটা স্বাভাবিক। আলতাফ হোসেন হালী ভারতীয় মুসলিমদের অধঃপতনে ব্যথা বোধ করিয়াছেন এবং ইসলামের মনোজ্ঞ রূপই তাঁর কাব্য-তুলিকায় অনবদ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্য বা তাঁর সুন্দর সাবলীল ভাষা শুধু মুসলিমেরই উপভোগ্য নয়; তার আবেদন বরং সর্বজনীন। মিসেস্ সরোজিনী নাইডু তাঁর বক্তৃতায় অকুণ্ঠিত চিত্তে এটা স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।"

২৭ : ৪ ।। ফাল্গুন ১৩৫১

কবি কুমুদরঞ্জন

"কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়কে তাহার ৬২ তম জন্মতিথি উপলক্ষে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, এজন্য আমরা আনন্দিত। তিনি যেরূপ নিষ্ঠার সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাহাতে বহু দিন পূর্বেই তাঁহার সম্বর্ধনা হওয়া উচিত ছিল। এছাড়া তাঁহার বয়সের একটা সন্ধিস্থান (যেমন, ৫০ তম বা ৬০তম জন্ম দিন) অবলম্বন করিয়াই এই অনুষ্ঠানটী সম্পন্ন হইতে পারিত; ৬২তম জন্ম তিথি সম্বর্ধনার যোগ্য কোন সময় বা উপলক্ষ নয়। আরও কথা এই যে, সংবাদে দেখিলাম, পৌত্তলিক হিন্দুয়ানী-ব্যঞ্জক 'বন্দেমাতরম্' গানটী গাহিয়া সম্বর্ধনা-সভার উদ্বোধন করা হইয়াছে এবং হিন্দু প্রথায় মঙ্গলাচরণ-পূর্বক কবিরললাটে চন্দন ও কুঙ্কুমের তিলক আঁকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানানো হইয়াছে। ইহাতে ব্যাপারটী, সম্পূর্ণরূপে হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কবিকে কি বাংলার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে, আমাদের কিছুই বলিবার নাই। আর যদি তাহা হইয়া থাকে, তা হইলে অনুষ্ঠানের হিন্দু উদ্যোক্তারা বাংলার সম্মিলিত জীবন-সম্বন্ধে যে-গভীর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেশের পক্ষে সর্বথা অনিষ্টকর, একথা বলিতেই হইবে।"